বংশ-পরিচয়

(একাদশ খণ্ড)

প্রজাপতি-সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সঙ্কলিত

আশ্বিন—১৩৩৭

মূল্য ১৲

প্রকাশক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার

২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
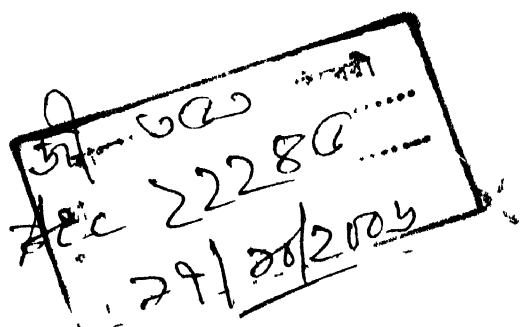
প্রিণ্টার

শ্রীরসিকলাল পান

গোবর্দ্ধন প্রেস

২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লোকহিত-পরায়ণ প্রজাবৎসল

বিদ্যোৎসাহী অশেষ গুণালঙ্কৃত

সাহিত্যের পৃষ্টপোষক

ময়ূরভঞ্জাধীশ্বর

মাননীয় শ্রীল মহারাজ প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জদেও

মহোদয়ের পবিত্র করকমলে

"বংশপরিচয়" একাদশ খণ্ড

শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শণস্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল।

মহারাজা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জ দেও

সূচীপত্র।

স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও

বংশ-পরিচয়

ময়ূরভঞ্জের অধীশ্বর

স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব

ময়ূরভঞ্জ রাজ্য

ময়ূরভঞ্জ রাজ্য অতীব প্রাচীন। উড়িষ্যার করদরাজ্যসমূহের মধ্যে ইহা বৃহত্তম। ইহার উত্তর সীমায় মেদিনীপুর ও সিংহভূম জেলা; পূর্ব্ব সীমায় মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলা; দক্ষিণ সীমায় নীলগিরি ও কেওঞ্ঝর রাজ্য এবং পশ্চিম সীমায় কেওঞ্ঝর ও সিংহভূম জেলা। ময়ূর-ভঞ্জ রাজ্যের পরিমাণফল ৪,২৪৩ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে ৭,৫৪, ২০৩।

উৎপন্ন দ্রব্য

ময়ূরভঞ্জের প্রধান কৃষিজাত সামগ্রী হইতেছে চাউল, ভুট্টা, সরিষা, তিসি, বাজরা এবং শাকসব্জী। এসকল ব্যতীত অরণ্য ও খনিজ পদার্থসমূহও আছে; উহাদের মধ্যে শাল, সেগুন, শিশু প্রভৃতি কাষ্ঠ, গালা, তসর, লৌহ, পাথুরে চূণ, যে শ্রেণীর প্রস্তর হইতে তৈজসপত্র তৈয়ারী হয় সেই জাতীয় প্রস্তর ইত্যাদি প্রধান। স্বর্ণ, অভ্র এবং রক্ত ও পীতবর্ণ গিরিমাটী ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে পাওয়া যায়।

প্রধান প্রধান পথ

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পথ বা রাস্তা আছে ; এইগুলির মধ্যে বারিপদা-চাইবাসা, বারিপদা-মেদিনীপুর এবং বারিপদা-বালেশ্বর নামক তিনটী পথই প্রধান। এইগুলি রাজ্যের সদর বা রাজধানীর সহিত পার্শ্ববর্ত্তী ব্রিটিশ জেলা-সদরগুলির সংযোগ-সাধন করিতেছে। প্রস্তাবিত বৃত্তাকার পথসমূহের দৈর্ঘ্য মোট ১৭০ মাইল ; তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৯৭ মাইল পথ প্রস্তুত হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের সমগ্র বৃত্তাকার পথ-সমূহের এবং নয়াবাসান রাজ্যের পথসমূহের মোট দৈর্ঘ্য ৬০৬ মাইল। অবশ্য এইসকল রাস্তা ছাড়া আরও কতকগুলি রাস্তা আছে, সেগুলি বর্ষা ব্যতীত অন্যান্য ঋতুতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রেলপথ

সাধারণ রাস্তা ব্যতীত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যমধ্যে রেলপথও আছে ; যথা—(১) ময়ূরভঞ্জ লাইট রেলওয়ে—ইহা রূপসা হইতে তালবাঁধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ৭১ মাইল ; (২) টাটানগর-গুরুমহিষাণী ব্র্যাঞ্চ রেলওয়ে (ব্রড গেজ), ইহা গুরুমহিষাণীতে টাটা কোম্পানীর যে লোহার কারখানা তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে ; (৩) অনলাজুড়ি-বাদামপুর রেলপথ—ইহা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের শাখা, ইহা ব্রড গেজ এবং অনলাজুড়ি হইতে বাদামপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

শিক্ষা

রাজধানী বারিপদাতে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় (High English School) আছে। তদ্ব্যতীত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৬টী মধ্য ইংরেজী, ২১টী উচ্চ প্রাথমিক এবং ৩৫২টী নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। আরও ৭টী বালিকা বিদ্যালয়, ৩টী মক্তব, একটী সংস্কৃত টোল, একটী গুরু ট্রেণিং স্কুল রাজকীয় ব্যয়ে পরিচালিত হইয়া থাকে

বিদ্যালয়ে পাঠকারী ছাত্রের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ২১ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ২। শিক্ষার জন্য ময়ূরভঞ্জ সরকার বৎসরে ১,৩৬,৩১৯৵৪ খরচ করিয়া থাকেন। বারিপদার ইংরেজী বিদ্যালয়, সমস্ত মধ্য ইংরেজী ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অধিকাংশ নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত ছাত্রাবাস আছে।

স্বাস্থ্য

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে ১১টী দাতব্য চিকিৎসালয় বা ডিস্পেন্সারী ও হাসপাতাল আছে। রাজ্যের সমস্ত ডিস্পেন্সারীতে বৎসরে গড়পড়তা ১,২৪,৬৩৮ জন চিকিৎসিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১২৫০ জন রোগী ডাক্তারখানার ভিতরে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে (indoor patients) এবং ১,২৩,৩৮৮ রোগী ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইয়া চিকিৎসা করাইয়াছে (outdoor patients)। এই সকল চিকিৎসালয় পরিচালনার জন্য ময়ূরভঞ্জ-সরকারকে বৎসরে ৫১,৪৫২৵৩ ব্যয় করিতে হয়। গত ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে বিনামূল্যে জনসাধারণকে টীকা দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শিল্প

ময়ূরভঞ্জের গুরুমহিষাণী, সুলাইপাট ও বাদামপুর—এই তিনটী স্থানে অপরিষ্কৃত লৌহের খনি আছে। এই খনিগুলি মেসার্স টাটা আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেডকে ইজারা দেওয়া হইয়াছে। টাটা কোম্পানী এই খনিগুলি হইতে অপরিষ্কৃত লৌহ বাহির করিয়া ময়ূরভঞ্জ হইতে রপ্তানি করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ময়ূরভঞ্জবাসী বহু শিল্পী লৌহ গলাইয়া সাবেক যন্ত্রাদির সাহায্যে নানাবিধ দ্রব্য তৈয়ারি করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত প্রস্তর-জাত তৈজসপত্র বহু পরিমাণে তৈয়ারী হইয়া থাকে এবং শিল্পিগণ ঐগুলি বাহিরে রপ্তানি করিয়া থাকে। তসর ও গালার

কীট পালন এবং তসর বয়ন ও গালা তৈয়ারী ময়ূরভঞ্জের অন্যতম শিল্প; এই রাজ্যের বামনঘাটী মহকুমা তসর ও গালা শিল্পের কেন্দ্রস্থান। ময়ূরভঞ্জ সদর মহকুমা ও বামনঘাটী মহকুমায় উৎকৃষ্ট তসরের কাপড় তৈয়ারী হইয়া থাকে। লাঙ্গল, লাঙ্গলের ফলা, কোদাল, কুড়াল, গাঁতি, প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রপাতি এই রাজ্যে তৈয়ারী হইয়া থাকে।

রাজ্যের আয়

সর্ব্বপ্রকারে ময়ূরভঞ্জের বার্ষিক আয় (গড়পড়তা তিন বৎসরের হিসাব-পরীক্ষায়) ২৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮ শত ৮০ আশী টাকা। ময়ূরভঞ্জরাজ প্রতি বৎসর ইংরেজ গবর্মেণ্টকে ১০৬৭॥৶৯ পাই কর দিয়া থাকেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি-অনুসারে এই কর চিরস্থায়ী হিসাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে অর্থাৎ যতদিন এই সন্ধির সর্ত্ত বলবৎ থাকিবে ততদিন এই করের হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না।

শাসনকার্য্য

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের শাসন-কার্য্য মহারাজা স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া থাকেন। মহারাজের উপর কঠোর অপরাধজনক ফৌজদারী মামলার বিচার-ভার বিন্যস্ত আছে। রাজ্যশাসন-কার্য্যে দেওয়ান, প্রধান বিচারপতি (State Judge) এবং অন্যান্য বিভাগের কর্ত্তৃগণ মহারাজকে সাহায্য করিয়া থাকেন। দেওয়ান রাজস্ববিভাগের কর্ত্তা এবং প্রধান বিচার-পতি বিচার-বিভাগের কর্ত্তা। মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণের উপর রাজস্ব, ফৌজদারী ও দেওয়ানী-সংক্রান্ত মামলার বিচারের ক্ষমতা আছে; অবশ্য সে ক্ষমতার গণ্ডী বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যে পুলিশ কর্ম্মচারীর সংখ্যা এইরূপঃ—উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারী ৭৭ জন; কনষ্টেবল বা প্রহরী ৩০০ জন এবং অস্ত্রধারী কনষ্টেবল বা প্রহরী ৫০

জন। ইহারা ব্যতীত ৪০১ জন জায়গীর-ভোগী এবং ১১৫ জন বেতন ভোগা পাইক আছে; এইসকল পাইক পুলিশ-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

মিউনিসিপ্যালিটী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

রাজধানী বারিপদাতে মিউনিসিপ্যালিটী আছে। এই মিউনিসি-প্যালিটীর চৌহদ্দী ২ বর্গ মাইল; ইহার এলাকাভুক্ত অধিবাসীর সংখ্যা ৬১৮৯ এবং ইহার বার্ষিক আয় ৩৫,৬২৯॥৵৮ পাই। বারিপদা নগরীতে একটি পাব্লিক লাইব্রেরী বা সাধারণ পাঠাগার আছে; ইহার পুস্তক-সংখ্যা ৫,৫২২। এই পাঠাগার-সংলগ্ন একটি কৌতুকাগার বা যাদুঘর (mus·um) আছে, ইহাতে ময়ূরভঞ্জের শিল্প ও কৃষিজাত সামগ্রী, খনিজ ও বনজ দ্রব্যসমূহ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। বারিপদায় একটি অনাথ আশ্রম আছে; উহাতে ১৯টী অনাথ বালক-বালিকা লালিত-পালিত হইয়া থাকে। একটি কুষ্ঠাশ্রম আছে, উহাতে ১০৩টী কুষ্ঠরোগীকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। বারিপদাতে একটি ধর্ম্মশালা আছে; নবাগত অতিথিগণ এখানে দুই দিন থাকিতে পারেন; এই দুই দিন তাঁহাদিগকে রাজসরকার হইতে বিনামূল্যে আহার্য্য দেওয়া হইয়া থাকে।

ময়ূরভঞ্জ-রাজবংশ

ময়ূরভঞ্জ রাজ্য ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই রাজ্য বা রাজবংশের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। তবে এই রাজ্য ও রাজবংশ যে অতীব প্রাচীন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব এই সুপ্রাচীন রাজবংশ-সম্ভূত। এই রাজ-বংশ বল-বীর্য্যশালী ও সাহস-সম্পন্ন; কিন্তু বিনা কারণে কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন না। সাধারণতঃ ইহারা শান্তিপ্রিয় এবং প্রতিবেশী রাজগণের সহিত সদ্ভাবেই বাস করিতেন। কিন্তু কেহ

অন্যায়রূপে ইঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিলে ইঁহারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। স্বাধিকার-রক্ষায় ইঁহারা কদাচ বিমুখ হইতেন না।

ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জয়সিংহ

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্যর উইলিয়াম হাণ্টার বলেন,—কিম্বদন্তী অনুসারে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের বয়ঃক্রম ২০০০ বৎসরেরও অধিক। কিন্তু এই রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব ছামুকরণ দামোদর পট্টনায়ক যে সকল কিম্বদন্তী ও বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছিলেন তদনুসারে ময়ূরভঞ্জ রাজ্য প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—এইরূপ আভাস পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠাতার নাম জয়সিংহ; ইনি রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুরের তদানীন্তন মহারাজার জনৈক আত্মীয় ছিলেন। জয়সিংহ পুরীধামে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন। একটী বিবরণে প্রকাশ,—তিনি পুরী-রাজ গজপতির কন্যাকে বিবাহ করেন এবং বিবাহে হরিহরপুর যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ময়ুরভঞ্জের কিম্বদন্তীতে প্রকাশ যে, তিনি পুরীধামে তীর্থ-পর্য্যটনে আসিবার সময়ে তাঁহার দুই পুত্রকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। এক পুত্রের নাম আদি সিংহ ও অপর পুত্রের নাম যতি সিংহ। জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত পুরীরাজের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে জয়সিংহ বামনঘাটীর রাজা ময়ূরধ্বজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন এবং "ভঞ্জ" উপাধিধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। এই "ভঞ্জ" অর্থাৎ ভঙ্গকারী শব্দ হইতেই ময়ুরভঞ্জ নামের উৎপত্তি। অদ্যাবধি লোকে বামনঘাটীকেই এই রাজবংশের আদি বাসভবন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জয়সিংহের সময়ে রাজকীয় দলিল-দস্তাবেজে যে শীলমোহরের ছাপ দেওয়া হয় তাহাতে ময়ূরের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। এই ময়ূরের চিহ্ন

ময়ূরভঞ্জের রাজবংশের কুলচিহ্ন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ময়ূর রাজপুতনার বহু অভিজাত-বংশেরও কুলচিহ্ন। রাজপুতনায় ও ময়ূরভঞ্জে ময়ূর-শীকার বা ময়ূরবধ নিষিদ্ধ। অনেকে মনে করেন,—ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ময়ূরভঞ্জের রাজবংশের আদিপুরুষ রাজপুত। জয়সিংহ ময়ূরভঞ্জে বসবাস স্থাপন করেন এবং তথায় ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি হরিহরপুর রাজ্য তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। হরিহরপুর রাজ্য ময়ূরভঞ্জ ও কেওঞ্ঝর রাজ্য লইয়া গঠিত। জ্যেষ্ঠ পুত্র আদি সিংহ ময়ূরভঞ্জ রাজ্য প্রাপ্ত হন এবং আদিপুরে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কনিষ্ঠ যতি সিংহ কেওঞ্ঝর রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন এবং বৈতরণীনদীর অপর পারে যতিপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

আদি ভঞ্জ

আদি ভঞ্জ তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর ময়ূরভঞ্জের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৬১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত রাজ্য শাসন করেন। তিনি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যকে ২২টি ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক ভাগের শাসনভার একজন করিয়া সর্ব্বারকরের উপর ন্যস্ত করেন। সর্ত্ত ছিল এই যে, ইঁহারা যুদ্ধের সময় রাজ্যকে সাহায্য করিবেন এবং রাজস্ব আদায় করিয়া অর্দ্ধেক রাজাকে দিবেন ও অর্দ্ধেক তাঁহারা পুরস্কার-বা পারিশ্রমিকস্বরূপ লইবেন। রাজভক্তি ও রাজানুগত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে সর্ব্বারকর-পদ বংশানুক্রমিক থাকিত।

আদি ভঞ্জের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নীলাম্বর ভঞ্জ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ৬৮৯ খৃষ্টাব্দে নীলাম্বরের মৃত্যু হয়।

নীলাম্বর ভঞ্জের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ—কিশোর ভঞ্জ ও কনিষ্ঠ—লক্ষ্মণ-রাজ ভঞ্জ। পিতার মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ কিশোর ভঞ্জ তীর্থপর্য্যটনহেতু অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া কনিষ্ঠ লক্ষ্মণরাজ ভঞ্জ সিংহাসনে আরোহণ

করেন। কিশোর ভঞ্জ তীর্থ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কনিষ্ঠের সিংহাসন-প্রাপ্তির বিরোধী হয়েন নাই। সেইজন্য তাঁহার ভরণ-পোষণের নিমিত্ত একটী রাজ্য তাঁহাকে দেওয়া হয়। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ আদিপুর পরগণায় কতকগুলি নিষ্কর গ্রাম ভোগ-দখল করিতেছেন। লক্ষ্মণরাজ ভঞ্জের রাজত্বকালে যোশীপুরের সর্ব্বারকর বিদ্রোহী হয়; লক্ষ্মণরাজ উহাকে পরাজিত করিয়া বিদ্রোহ দমন করেন।

লক্ষ্মণরাজ ভঞ্জের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বেশ্বর ভঞ্জ ৭২৬ খৃষ্টাব্দে ময়ূরভঞ্জের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জগদীশ্বর ভঞ্জ স্বীয় বুদ্ধিবলে কণিকা রাজ্য অধিকার করেন। বিশ্বেশ্বর ভঞ্জ অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া প্রজাগণ কয়েকজন সর্ব্বারকরের সাহায্যে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। বিশ্বেশ্বর ভঞ্জ কেওঞ্ঝরের রাজা অনন্ত ভঞ্জের সহায়তায় সেই বিদ্রোহ দমন করেন এবং বিদ্রোহী সর্ব্বারকরদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তাহাদের স্থলে নূতন সর্ব্বারকর নিযুক্ত করেন। এই বিদ্রোহের সময়ে সিমলিপাল, বামুনঘাটী ও যোশীপুরের সর্ব্বারকরগণ বিশ্বেশ্বর ভঞ্জের পক্ষেই ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রভূত পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিশ্বেশ্বর ভঞ্জের একমাত্র পুত্র ভরত ভঞ্জ ৭৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি প্রজারঞ্জক ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইনি সর্ব্বদা প্রজাগণের কল্যাণ সাধনে ব্রতী থাকিতেন। তিনি প্রত্যহ পূজাহ্নিক ও শাস্ত্রপাঠ না করিয়া আহার গ্রহণ করিতেন না। তিনি এরূপ দানশীল ছিলেন এবং দরিদ্রদিগকে এরূপ মুক্তহস্তে অর্থ দান করিতেন যে, তাঁহার কোষাগারে দৈনিক এক হাজার টাকার অধিক উদ্বৃত্ত থাকিত না। তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণ সুখ-শান্তিতে বাস করিত।

ভরত ভঞ্জের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ—দিলীপেশ্বর ভঞ্জ এবং কনিষ্ঠ—

মধুসূদন ভঞ্জ। ভরত ভঞ্জের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দিলীপেশ্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। প্রজাগণ তাঁহার শাসনকালে শান্তিভোগ করিয়াছিল। কোন প্রজা তাঁহার রাজত্বে আইনবিরুদ্ধ কার্য্য বা অপরাধ করিতে সাহস পাইত না। তিনি পিতার ন্যায় দানশীল ছিলেন না; তিনি রাজকোষ সর্ব্বদা অর্থে ও নানাবিধ রত্নাদিতে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদন মৃগয়ায় গমন করিয়া ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হন ও তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

দিলীপেশ্বরের পুত্র বামনদেব ভঞ্জ। ইনি ৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিলেন এবং ইঁহার শারীরিক বলও যথেষ্ট ছিল। ৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

বামনদেব ভঞ্জের পর তদীয় পুত্র বাসুদেব রাজা হযেন এবং ৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

বাসুদেব ভঞ্জের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ কেশরী ভঞ্জ ও কনিষ্ঠ হরিহর ভঞ্জ। জ্যেষ্ঠ কেশরী ভঞ্জ পিতার মৃত্যুর পর ময়ূরভঞ্জের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং কনিষ্ঠ হরিহরভঞ্জ কেওঞ্ঝরের রাজা হয়েন।

কেশরী ভঞ্জের পুত্র নারাযণ ভঞ্জ ৯৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্রের নাম নীলকণ্ঠ ভঞ্জ। নীলকণ্ঠের পুত্র বীরকেশ্বর ভঞ্জ ১০২৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম কপিলেশ্বর; ইনি ১০৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হয়েন ও ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কপিলেশ্বরের পুত্র ত্রিলোচন ১১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দাশরথি ভঞ্জ রাজা হইয়া ১১৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইনি আদিপুর হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

দাশরথি ভঞ্জের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ভঞ্জ ১১৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র গদাধর। গদাধরের পুত্র অরুণেশ্বর ভঞ্জ; ইনি আদিপুরে কিঞ্চকেশ্বরী মন্দির ও শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন; এই মন্দিরদ্বয় এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

অরুণেশ্বরের পুত্র গোপীনাথ ভঞ্জ। গোপীনাথের পুত্র রাধাকৃষ্ণ ভঞ্জ। রাধাকৃষ্ণের পর পৃথ্বীনাথ ভঞ্জ ১৩০১ খৃষ্টাব্দে রাজা হয়েন। পৃথ্বীনাথ অপুত্রক ছিলেন বলিয়া কেওঞ্ঝরের রাজার কনিষ্ঠ পুত্র বৈকুণ্ঠ ভঞ্জকে দত্তক গ্রহণ করেন।

বৈকুণ্ঠ ভঞ্জের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বীরেশ্বর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। ইনি রহণীগড় ও খুরাদিয়াতে শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র ভঞ্জকে দত্তক গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র ১৩৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি একটী গড় এবং মন্ত্রীতে একটী শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দির এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। শিবরাত্রি উপলক্ষে মন্ত্রীতে বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। ইনি মেদিনীপুরের জঙ্গল মহালের কিয়দংশ অধিকার করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন এবং নবাধিকৃত অঞ্চলকে ভঞ্জভূমি আখ্যা প্রদান করেন।

রামচন্দ্র ভঞ্জের জ্যেষ্ঠপুত্র বলভদ্র ভঞ্জ ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার খনিত সুবৃহৎ পুষ্করিণী আজিও অমরদা নামক স্থানে বিদ্যমান।

বলভদ্রের পুত্র হরেকৃষ্ণ ভঞ্জ রাজা হইয়া হরিহরপুরে একটি গড় ও কয়েকটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র নীলকণ্ঠ ভঞ্জ ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। নীলকণ্ঠের পুত্র সাম্হাই ভঞ্জ ভঞ্জভূমি মেদিনীপুরের রাজাকে প্রত্যর্পণ করেন। ইনি বারিপদায় বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন ও বাঘসামালে একটী গড় নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার পুত্র বৈদ্যনাথ

ভঞ্জ ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৈদ্যনাথ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। বারিপদায় হরিবল্লভ মহাপ্রভুর মন্দির, নাটমন্দির ও গুণ্ডিচামন্দির তাঁহার কীর্ত্তি আজিও ঘোষণা করিতেছে।

বৈদ্যনাথ ভঞ্জের পুত্র জগন্নাথ ভঞ্জ। জগন্নাথের পুত্র হরিহর ভঞ্জ। হরিহরের পুত্র সর্ব্বেশ্বর ভঞ্জ। সর্ব্বেশ্বরের পুত্র বিক্রমাদিত্য ভঞ্জ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ময়ূরভঞ্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন।

১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রঘুনাথ ভঞ্জ ময়ূরভঞ্জের রাজা ছিলেন। ইনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া কেওঞ্ঝর রাজের দ্বিতীয় পুত্র চক্রধর ভঞ্জকে দত্তক গ্রহণ করেন। চক্রধর ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার অধঃপতনের পর ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জ-রাজগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইযা উঠেন এবং উড়িষ্যার পর্ব্বতমালা ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্ত্তী—আধুনিক বালেশ্বর ও মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত অঞ্চলসমূহ অধিকার করেন। ভঞ্জরাজবংশ কখনই বাঙ্গালার মুসলমান রাজাদিগের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই এবং মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা-জয়ের সময় পর্য্যন্ত মুসলমান রাজাদিগের প্রতিবন্ধকতা করিতেন।

চক্রধর ভঞ্জের পুত্র দামোদর ভঞ্জ। ইঁহার রাজত্বকালে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্রে সর্ব্বপ্রথম ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালায় ব্রিটিশ শক্তির অভ্যুত্থানের পরই অবিলম্বে ব্রিটিশ শাসকগণ ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জরাজগণের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভঞ্জরাজগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে কখনও নিয়মিতভাবে কর দিতেন না। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত ইংরেজদিগের যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে ভঞ্জরাজগণই সর্ব্বপ্রথম ইংরেজদিগকে সাহায্য

করেন। মহারাজা দামোদর ভঞ্জ উড়িষ্যার মহারাষ্ট্রীয় শাসকবর্গকে অবজ্ঞা করেন এবং সেইজন্য উড়িষ্যার মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তা ভবানী পণ্ডিত ময়ূরভঞ্জ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু দামোদর ভঞ্জ পার্ব্বত্য দুর্গ আশ্রয় করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন। মহারাজা দামোদর ভঞ্জ ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধানা মহিষী অর্থাৎ পাটরাণী মহারাজেশ্বরী সুমিত্রা দেবী রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ইংরেজ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা-বিজয়ের সময় পর্য্যন্ত রাজকার্য্য পরিচালন করেন। তিনি ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে লোক ও রসদ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিগণও সে উপকার বিস্মৃত হয়েন নাই। উড়িষ্যার গড়জাত মহালের যে সকল রাজ্য পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়গণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সেইসকল রাজ্য ব্রিটিশ গবর্মণ্টের সহিত বশ্যতা-মূলক সন্ধি স্থাপন করেন। গড়জাত মহালের সকল রাজ্যের সহিতই ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এইরূপ সন্ধি বা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু সে সময়ে ময়ূরভঞ্জকে ব্রিটিশ সরকার ঐসকল রাজ্যের দলভুক্ত করেন নাই। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ময়ূরভঞ্জের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েন। ব্রিটিশ সরকার ময়ূরভঞ্জকে উড়িষ্যার মধ্যে প্রধান করদরাজ্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং উহার সহিত তদনুরূপ সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহারাজেশ্বরী সুমিত্রাদেবীর পর তদীয় সপত্নী মহারাজেশ্বরী যমুনাদেবী ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ময়ুরভঞ্জের সিংহাসনে অরোহণ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ইহার দত্তকপুত্র মহারাজা ত্রিবিক্রম ভঞ্জদেব রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মহারাজা ত্রিবিক্রমের পুত্র মহারাজা যদুনাথ ভঞ্জ; ইনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহারই শাসনকালে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের সহিত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে রাজা যদুনাথ ভঞ্জ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বশ্যতা ও আনুগত্য

স্বীকার করেন এবং বংশানুক্রমে ব্রিটিশ সরকারকে বার্ষিক ১০০১৲ টাকা করিয়া কর দিতে স্বীকৃত হয়েন। আরও ব্রিটিশ অধিকার হইতে কোনও অপরাধী ময়ূরভঞ্জে পলায়ন করিলে তাহাকে ধৃত করিয়া ব্রিটিশ সরকারের হস্তে প্রদান করিতে, ব্রিটিশ সৈন্যকে তাঁহার রাজ্য দিয়া গমনাগমন করিতে, কোনও প্রতিবেশী রাজা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে তাঁহাকে দমন করিবার কার্য্যে ইংরেজ গবর্মেণ্টকে সৈন্যাদি দ্বারা সাহায্য করিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হয়েন। যদুনাথ ভঞ্জ প্রজানুরঞ্জক, সহৃদয়, দানশীল ও যোগ্য নৃপতি ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সহিত তাঁহার অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল। কয়েকজন সর্ব্বারকর প্রজাদিগের উপর অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াছিল বলিয়া তিনি উহাদিগকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁহাদের স্থলে খাস তহশীলদার নিযুক্ত করিয়া দেন। বামনঘাটির সর্ব্বারকার বিরুদ্ধাচারী হইয়া বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু রাজা যদুনাথ তাহাকে দমন করেন এবং বামনঘাটি খাস করিয়া লয়েন।

মহারাজা যদুনাথ ভঞ্জের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীনাথ ভঞ্জ; মধ্যম পুত্র সীতানাথভঞ্জ এবং কনিষ্ঠ পুত্র দ্বারকানাথ ভঞ্জ। জ্যেষ্ঠ শ্রীনাথভঞ্জ পিতৃসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইযাছিলেন। কিন্তু রাজা হইয়া তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তিনি অকপট ও দয়ালু ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ সময় ভোগ-বিলাসে ও আমোদ-প্রমোদে ব্যয়িত হইত। শাসন-কার্য্য তিনি স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন না; স্বার্থ-পরায়ণ পারিষদবর্গ যাহা বলিতেন অকপটে তাহাই বিশ্বাস করিতেন। ফলে শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। বামনঘাটি ও আপার ভাগ পরগণার লোক শাসন-শৈথিল্যের ফলে লুঠতরাজ, দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রভৃতি অপকর্ম্ম করিতে থাকে। সেইজন্য ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বামনঘাটি মহকুমার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং উহা সিংহভূমের

ডেপুটী কমিশনারের উপর ন্যস্ত করেন। শ্রীনাথ ভঞ্জ অপুত্রক ছিলেন; সেইজন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ ময়ূরভঞ্জ রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েন। কিন্তু শ্রীনাথচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে দুইচক্ষে দেখিতে পারিতেন না; সেইজন্য কৃষ্ণচন্দ্র যাহাতে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী না হয়েন ও তাঁহার স্থলে এক অনাথ ব্রাহ্মণবালক রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারে, এইরূপ চেষ্টা তিনি করিতে থাকেন। কিন্তু সুখের বিষয়, উড়িষ্যা বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার ও উড়িষ্যার করদরাজ্যগুলির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার টি-ই রাভেন্সা ময়ূরভঞ্জরাজ্যের ও কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু ছিলেন, তিনি শ্রীনাথচন্দ্রের এই চেষ্টার প্রতিকূলতা করেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রকে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের পরিচালক (Manager) নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্যের সুশাসন-সম্বন্ধে তাহাকে যেসকল পরামর্শ দিতেন রাজা শ্রীনাথভঞ্জ সে সকলে কর্ণপাত করিতেন না এবং ভোগবিলাসেই মগ্ন হইয়া থাকিতেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজা শ্রীনাথচন্দ্র ভঞ্জের মৃত্যু হয় এবং কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই শাসনসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েন। পিতৃব্যের জীবিতকালে তিনি শাসন-কার্য্যের উন্নতির জন্য যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং যেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, সেইসকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র অষ্টাদশ বৎসর। তাঁহার আকৃতি ছিল যেমন সুন্দর, প্রকৃতিও ছিল তেমনিই সুন্দর; তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সহৃদয় ও শিষ্টাচারসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ইংরেজী লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞতা তাঁহার যথেষ্টই ছিল এবং ময়ূরভঞ্জের শাসকরূপে তিনি প্রভূত যোগ্যতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। শাসন-ব্যাপারে মিষ্টার রাভেন্সা তাঁহাকে সৎপরামর্শ দিতেন। রাজ্যভার-গ্রহণের পর শ্রীনাথ-

চন্দ্রের অনুরাগী রাজকর্ম্মচারিগণ, এমন কি শ্রীনাথচন্দ্রের বিধবা মহিষী পর্য্যন্ত তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন কিন্তু মহিষী যখন দেখিলেন যে, এই চেষ্টা ফলবতী হইবে না, তখন তিনি এই কার্য্য হইতে বিরত হয়েন এবং ক্রমশঃ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি স্নেহপরায়ণা হইয়া উঠেন। এই কৃষ্ণচন্দ্রই ময়ূরভঞ্জে সুশাসনের বীজ রোপণ করেন এবং পরে উহা অঙ্কুরিত হইয়া তদীয় পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেবের আনুকূল্যে ফল-ফুলে সুশোভিত বৃক্ষে পরিণত হয়। রাজ্যশাসনে যোগ্যতা ও সাধারণ-হিতকর কার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্যের জন্য ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি কটক হাই-স্কুলকে কলেজে পরিণত করিবার জন্য ২৭,০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন; ইহাই এক্ষণে রাভেন্সা কলেজ নামে আখ্যাত এবং ইহাই উড়িষ্যায় একমাত্র কলেজ। ময়ূরভঞ্জ রাজ্য ইনি যোগ্যতার সহিত পরিচালন করিতেছিলেন বলিয়া, সুশাসনের পুরস্কারস্বরূপ বামনঘাটি মহকুমা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ইঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করেন।

আধুনিক শাসন-পদ্ধতির বীজরোপণ

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে শাসন-কার্য্যের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি সুশাসনের সুবিধার জন্য দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এক একটী বিভাগ এক একজন যোগ্য কর্ম্মচারীর কর্ত্তৃত্বাধীন করিয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে বিচারালয়ের কার্য্যে শৃঙ্খলা ছিল না; নথিপত্র, দলিল, রায় ইত্যাদি রক্ষিত করিবার ব্যবস্থা ছিল না। পূর্ব্বে দেওয়ান ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা মুখে মুখেই বিচার করিতেন, কালি-কলমের ধার ধারিতেন না; যদি বা কখনও লিখিবার প্রয়োজন হইত তবে কাগজ ব্যবহৃত হইত না, উহার স্থলে তালপত্র ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্বে

বিচারালয়ের কর্ম্মচারীরা মাদুরে বা গালিচার উপরে বসিতেন এবং তথায় বসিয়াই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। কেবল পদমর্য্যাদার জন্য দেওয়ানকে বসিবার নিমিত্ত মাদুরের উপর গদী ও গদীর চারিপার্শ্বে বালিশ দেওয়া হইত। দেওয়ান মুখে মুখেই রায় দিতেন বা হুকুম জারি করিতেন, কলমে হাত দিতেন না। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই পুরাতন প্রথা উঠাইয়া দেন এবং পদস্থ কর্ম্মচারিগণের জন্য টেবিল চেয়ার ও তাঁহাদের সহকারীদের জন্য বেঞ্চের ব্যবস্থা করেন। কেবল নাজর, মুহুরী ও অন্যান্য নিম্নতন কর্ম্মচারীদের জন্য পূর্ব্ববৎ মাদুর বা সতরঞ্চের ব্যবস্থাই বহাল রহিল। তাঁহার আদেশে রীতিমত রেকর্ড রাখিবার বন্দোবস্ত হইল; ফাইলের ব্যবস্থা হইল; নালিশের দরখাস্ত, সাক্ষীদের জবান-বন্দী প্রভৃতি রীতিমত কাগজে লিখিয়া পেশ করিবার ও ঐগুলি সুরক্ষিত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। এইসকল কাগজপত্র রাখিবার জন্য রেকর্ড রুম বা মহাফেজখানা স্থাপিত হইল। নোটীশ, সমন ধরাইবার জন্য পেয়াদা নিযুক্ত হইল এবং সেজন্য রাজসরকার হইতে ফী বা পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হইল। ক্রমে কোর্ট ফী গ্রহণের প্রথাও প্রবর্ত্তিত হইল। মামলাকারীদের পক্ষ-সমর্থনের জন্য কয়েকজন মোক্তারকে আদালতে ভর্ত্তি করা হইল এবং রাজসরকারের পক্ষ-সমর্থনের জন্য রাজকীয় উকীলও নিযুক্ত হইলেন। বারিপদায় একটী রেজিষ্ট্রী অফিস স্থাপিত হইল এবং ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধক ইত্যাদি বিষয়ক দলিল রেজিষ্টারীর জন্য কলেক্টরের অধীনে একজন সব-রেজিষ্টার নিযুক্ত করা হইল। নিম্ন আদালতের বিচার-ফলে কেহ অসন্তুষ্ট হইলে সে ব্যক্তি যাহাতে মহারাজার নিকট আপীল করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইল। মহারাজার নিকট আপীল হইলে তিনি মামলার নথিপত্র তলব করিতেন এবং উভয় পক্ষের মোক্তারগণের বক্তব্য শুনিয়া স্বহস্তে রায় লিখিতেন। তাঁহার বিচারে সকলেই সন্তুষ্ট হইত।

পুলিশ-বিভাগের সৃষ্টি

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পুলিশ-বিভাগের পত্তন করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত পুলিশ-বিভাগের গঠন-পদ্ধতি এইরূপ ছিল—ময়ূরভঞ্জের প্রত্যেক পরগণার প্রত্যেক সর্দ্দারের উপর পুলিশের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। ইঁহারা প্রত্যেকে পুলিশ সব-ইনস্পেক্টরের ন্যায় কার্য্য করিতেন, তদ্ব্যতীত ইঁহাদের এলেকার ছোট-খাট অপরাধের বিচার করিতেন; অপরাধ গুরু হইলে খাস রাজকর্ম্মচারিগণ উহার তদন্ত ও বিচার করিতেন। রাজধানী বারিপদাতে পুলিশ কনষ্টেবল বা প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র জেল ও হাজতের সৃষ্টি করেন; তাঁহার পূর্ব্বে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে বিচারাধীন আসামীকে হাত-পা বাধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। তখন জেল কাহারও হইত না, জরিমানা হইত; সুতরাং জেল বা কারাগৃহ রাখিবার প্রয়োজন ছিল না।

রাজস্ব-ব্যবস্থা

পূর্ব্বে রাজস্ব-নির্দ্ধারণের কোনও সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। পল্লীর প্রধানেরা রাজসরকারে রাজস্ব পাঠাইয়া দিত। উহারা রায়তদিগের নিকট হইতে সেই রাজস্ব সংগ্রহ করিত। প্রধানেরা প্রায়ই রায়তদিগের উপর জোর-জুলুম করিয়া বেশী রাজস্ব আদায় করিত এবং নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব রাজসরকারে পাঠাইয়া অবশিষ্ট নিজের কুক্ষিগত করিত। উহারা চাষাদিগকে যে জমি ইজারা দিত বা বিলি করিত, তাহার মাপ বা খাজনার নিরিখ ছিল না; যাহার নিকট যেরূপ ইচ্ছা খাজনা লইত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রত্যেক পরগণার জমি জরিপ করেন এবং জমির পরিমাণ অনুসারে খাজনা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। এজন্য জরিপ-বিভাগ স্থাপিত হয়।

পূর্ত্ত-বিভাগ

রাজকীয় ইমারত-নির্ম্মাণ ও সংস্কার এবং পথ-নির্ম্মাণের জন্য মিষ্টার জে-এল এটাকিনসনের অধীনে পূর্ত্তবিভাগ (Public Works Department) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্ব্বে এই শ্রেণীর কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। এই বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইলে প্রথমে রাজধানী বারিপদার রাস্তাসমূহ পাকা করা হয়; তাহার পর বারিপদা হইতে বালেশ্বর এবং বাহাল্‌দা পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা তৈয়ারী করা হয়। ইতিপূর্ব্বে গোল বারান্দা, সাতবখরা ও অন্যান্য দুই একটী ইমারত ব্যতীত রাজপ্রাসাদে পাকা বাটী ছিল না—খড়ো ঘর ছিল। পূর্ত্তবিভাগ সেইগুলিকে ইষ্টকনির্ম্মিত পাকা বাড়ীতে পরিণত করেন। এই সময়ে সিংহদ্বার নির্ম্মিত হয়; স্কুলবাড়ী, থানা, ডাকঘর ও গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীদের অবস্থানের জন্য গোলাপবাগে বিশ্রাম-বাটী তৈয়ারী হয়।

শিক্ষা-বিভাগ

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে শিক্ষা-বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ডাক্তার এইচ-সি বাউজার। ইনি ময়ূরভঞ্জের মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। এই সময়ে বারিপদায় একটী স্কুল স্থাপিত হয় এবং একজন ইংরেজী-জানা শিক্ষক ও একজন উড়িয়া পণ্ডিতের উপর স্কুল-পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। উড়িয়া ভাষা ও সামান্য ইংরেজী এই স্কুলে তখন শিক্ষা দেওয়া হইত। বামনঘাটি ও পাঁচপীর মহকুমার নানা স্থানে অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষাদানের জন্য ঐসকল বিদ্যালয়ে উড়িয়া পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করা হয়। এইসকল বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না; বিদ্যালয়-পরিচালনের ব্যয় রাজসরকার হইতে দেওয়া হইত।

দাতব্য চিকিৎসালয়

বারিপদায় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়; ডাক্তার বাউজার ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। রাজবাটীর একটী গৃহে ইহা অবস্থিত ছিল। সে সময়ে লোকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতির উপর আস্থাবান্ ছিল না। সেইজন্য ডাক্তার বাউজারের নিকট রোগী প্রায় আসিত না বলিয়া তিনি পদত্যাগ করেন। পরে হস্পিট্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট বাবু প্রভাকর দাসের আমলে এই ডাক্তারখানা কতকটা লোকপ্রিয় হইয়া উঠে। এই দাতব্য ডাক্তারখানা ব্যতীত একটী আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ও ছিল এবং রাজসরকারের ব্যয়ে একজন কবিরাজ ইহার পরিচালন করিতেন।

ডাকের ব্যবস্থা

ডাকঘরের একরূপ ব্যবস্থাও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে হইয়াছিল। ডাকঘরের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য বারিপদা ও বালেশ্বরে একজন করিয়া কর্ম্মচারী (Postal clerk) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বারিপদার ডাক-কর্ম্মচারী বারিপদা হইতে প্রেরিত চিঠিপত্র বালেশ্বরের ডাক-কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। তিনি সেইগুলি তথাকার ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ডাকঘরে পাঠাইয়া দিতেন। পক্ষান্তরে বালেশ্বরের ব্রিটিশ ডাকঘরের কর্ম্মচারীরা ময়ূরভঞ্জের চিঠিপত্র ইত্যাদি বালেশ্বরস্থিত ময়ূরভঞ্জ রাজের ডাক-কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতেন; তিনি সেইগুলি বারিপদার ডাক-কর্ম্মচারীর নিকটে পাঠাইয়া দিতেন। তথা হইতে সেইগুলি বিলি করা হইত।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

এইসকল ব্যতীত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শাসনকালে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। বারিপদায় একটী মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপাখানা স্থাপিত হয়; ময়ূরভঞ্জ রাজ-সরকারের সকল প্রকার ছাপার কার্য্য

তথায় সম্পাদিত হইত। একটি পাঠাগার (Library) এই সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল; উহাতে বহু ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল। গোলাপবাগে একটি সুন্দর উদ্যান রচিত হয় এবং তথায় নানাপ্রকার ফলের গাছ রোপিত হয় ও শাক-সব্জীর চাষ হইতে থাকে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সময়ে প্রচলিত পুরাতন ধরণের শাসন-পদ্ধতির স্থলে আধুনিক শাসন-পদ্ধতির মূল পত্তন করেন এবং এই বেদীর উপরেই তাঁহার পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব পূর্ণভাবে আধুনিক শাসন-ব্যবস্থার সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব

জন্ম ও শৈশব

শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিলে তদীয় পিতৃদেব মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণকে ও দরিদ্রদিগকে অর্থদান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি কোনও কোনও ব্যক্তিকে ভূমি দান পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া বহু লোকের শুভেচ্ছা ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন।

পঞ্চম বর্ষ বয়সে তিনি জনৈক উড়িয়া পণ্ডিতের নিকট বর্ণমালা শিক্ষার দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহাকে প্রথমে খড়ি দিয়া মাটীতে অক্ষর লিখিতে হইত। তাঁহার স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁহার শিক্ষক একবার যাহা তাঁহাকে শিখাইয়া দিতেন, তিনি তাহা ভুলিতেন না। শিশুপুত্রের এইরূপ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া তাঁহার পিতা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই; যেহেতু তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই তীক্ষবুদ্ধি ও

বিচারশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। প্রায় দুই বৎসর কাল এই উড়িয়া 'অবধান' বা শিক্ষকের নিকট শ্রীরামচন্দ্র উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করেন। অতঃপর তাঁহাকে ইংরেজী শিখাইবার একজন সামান্য ইংরেজী-জানা শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। ইংরেজী শিক্ষার সহিত উড়িয়া ভাষাও তিনি শিক্ষা করিতে থাকেন। আরও দুই বৎসর কাল এইরূপে শিক্ষা লাভ করিবার পর তাঁহাকে বারিপদার ইঙ্গ-বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। ইহার কিছুদিন পরে ময়ূরভঞ্জ ও কেওঞ্জরের স্কুল-সমূহের সব্-ইনস্পেক্টর পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র মহাপাত্রকে তাঁহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়; তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে সংস্কৃত ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিতে থাকেন। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্রকে শ্রীরামচন্দ্রের গৃহশিক্ষকের কার্য্য করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়াই ময়ূরভঞ্জ রাজসরকারে তিনি এই কর্ম্ম করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্রকে ময়ূরভঞ্জের কলেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং এই পদে কর্ম্ম করিবার সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উপনয়ন

নবমবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় শ্রীরামচন্দ্রের উপনয়ন হয়। এতদুপলক্ষে বিপুল সমারোহ ও উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইহার পর দুই বৎসর সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইল। এই সময়ে বালক শ্রীরামচন্দ্রকে তীব্র শোকাবেগ সহ্য করিতে হয়; প্রথমে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তাহারই অল্প কয়েকদিন পরেই তাঁহার জননীও পরলোক গমন করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলে তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন; কিন্তু সে ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল।

বসন্তরোগে আক্রান্ত

এই সময়ে বারিপদায় বসন্তরোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হয় এবং শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম এই উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়েন। এই ঘটনায়

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। কারণ শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মনে করিতেন। তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের রোগশয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলেন ও তাঁহার শুশ্রূষায় ব্রতী হইলেন। তিনি সর্ব্বদাই এই বলিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে ভগবান আমার স্নেহাস্পদ পুত্রের জীবন রক্ষা কর।" তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ হইল।

পিতা-মাতার মৃত্যু

শ্রীরামচন্দ্র রোগমুক্ত হইলেন; কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাণী এবং রাজ-পরিবারের অন্যান্য কয়েকজন দুরন্ত বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন। সেই সময়ে বসন্তরোগে বারিপদা-বাসী বহুলোক কাল-কবলিত হইতেছিল। সিভিল সার্জ্জন ও বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহায্যার্থ বারিপদায় ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু চিকিৎসা ব্যর্থ হইল; মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলেন। ইতিহাসে এইরূপ একটী তুল্য ঘটনার উল্লেখ আছে। সে ঘটনাটী হইতেছে এই—হুমায়ুনের পীড়া হইলে তাঁহার পিতা মোগল-সম্রাট বাবর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন —"আমার পুত্রের রোগ আমাকে দিয়া আমার পুত্রকে রক্ষা কর।" ভগবান সে বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুন রোগের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাবর রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে সমগ্র ময়ূরভঞ্জ রাজ্য শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রজাই তাঁহার পরলোক-গমনে দুঃখ অনুভব করিয়াছিল। কারণ, তিনি প্রজারঞ্জক নৃপতি ছিলেন। মহারাজার মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই মহারাণীও তাঁহার অনুগমন করিলেন। ময়ূরভঞ্জবাসী একটী শোকের আঘাত হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে

আবার একটী শোকের আঘাত পাইল। এই সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের বয়স মাত্র ১২ বৎসর। এত অল্প বয়সেই তিনি পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অল্পভাষী এবং লাজুক ছিলেন; সেইজন্য এই গুরুশোকে তাঁহার বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিল না। পিতা-মাতার স্নেহ-বঞ্চিত হইয়া সত্তরোগমুক্ত রাজকুমার বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের নাবালক অবস্থায় রাজ্য-শাসনের ব্যবস্থা

পিতার মৃত্যুকালে শ্রীরামচন্দ্র অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ময়ূরভঞ্জরাজ্যের শাসনভার উড়িষ্যার করদরাজ্যসমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর ন্যস্ত করিলেন। তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার এইচ পি উইলিকে ময়ূরভঞ্জরাজ্যের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তিন পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্রকে নীলগিরির অপুত্রক রাজা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দত্তক গ্রহণ করেন এবং পরে তিনি নীলগিরির রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। তৃতীয় পুত্রের নাম শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব। ইনি তখন অত্যন্ত শিশু ছিলেন। এক্ষণে বারিপদায় থাকিয়া রাজপরিবারের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মিষ্টার উইলি ১৮৮২—৭৩ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টে তিন রাজকুমার সম্বন্ধে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজা শান্ত-শিষ্ট এবং সৎস্বভাব; ইঁহাকে ভিন্ন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও প্রভাবের মধ্যে শিক্ষিত করিতে পারিলে ইনি পরে একজন উৎকৃষ্ট পুরুষকার-সম্পন্ন নৃপতি হইতে পারিবেন। ইঁহার শরীর দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। ব্যায়াম ও আহার্য্যের অব্যবস্থাই ইহার কারণ হইতে পারে। যে রাজকুমারকে নীলগিরির রাজা দত্তক লইয়াছেন, সেই রাজকুমার তাঁহার অগ্রজ অপেক্ষা স্ফূর্ত্তিশীল এবং তাঁহার অপেক্ষা স্বাস্থ্যবান্। কনিষ্ঠ রাজকুমারের বয়স মাত্র চারি বৎসর।

শ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা

পিতৃবিয়োগের পর শ্রীরামচন্দ্র আরও প্রায় এক বৎসর বারিপদার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর উড়িষ্যার করদরাজ্যসমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় কটকে তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এইরূপ স্থির হয় যে, পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র মহাপাত্র শ্রীরামচন্দ্রের অভিভাবক-স্বরূপ কটকে গমন করিবেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহী প্রথমে সম্মত হয়েন নাই। তাহার কারণ আর কিছুই নহে—একে তিনি পুত্রশোকে বিহ্বলা, তাহার উপর পৌত্রকে বিদেশে পাঠাইলে সে বিচ্ছেদ-ব্যথা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। পৌত্রকে তাঁহার নিকট হইতে কটকে লইয়া যাওয়া হইবে বলিয়া তিনি ক্ষোভে দুঃখে প্রায় এক সপ্তাহ রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই। তার পর তিনি যখন ধীরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র কটকে যাইলে অধিকতর শিক্ষিত হইবেন ও যোগ্যতার সহিত ভবিষ্যতে রাজ্য পরিচালন করিতে পারিবেন, তখন তিনি তাঁহাকে কটকে যাইতে অনুমতি দিলেন; কিন্তু কনিষ্ঠ পৌত্রকে নিজের নিকটে রাখিয়া দিলেন, তাঁহাকে তাঁহার অগ্রজের সহিত কটকে যাইতে দিলেন না।

ইংরেজ শিক্ষকের অধীনে

কটকে যাইবার কয়েক মাস পরেই একমাত্র পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্রের হস্তে শ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষার ভার ন্যস্ত রাখা বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। কারণ, শ্রীরামচন্দ্র ত সাধারণ লোক নহেন, তিনি একটী রাজ্যের উত্তরাধিকারী, তাঁহাকে শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতে হইবে, বহুলোকের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা তাঁহাকে হইতে হইবে। সুতরাং তাঁহার শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর রিভার্স টমসন উপযুক্ত অভিভাবক ও শিক্ষকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে মিষ্টার এইচ্ বারট্রাম কিডেলকে তিনি

যোগ্যপাত্র মনে করিলেন ও তাঁহাকে দার্জ্জিলিঙ্গে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মিষ্টার কিডেল দার্জ্জিলিঙ্গে ছোটলাটের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—"ময়ূরভঞ্জের নাবালক রাজার শিক্ষার ভার আপনাকে দিতে চাই, লইবেন কি ?" মিষ্টার কিডেল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ময়ূরভঞ্জ কোথায় ?" ছোটলাট উত্তর করিলেন—"উড়িষ্যার জঙ্গল মহলে। তবে আপনাকে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে কটকে আপনার ছাত্রের সহিত থাকিতে হইবে, কারণ কটকে সুশিক্ষালাভের সুযোগ অ ধক।" মিষ্টার কিডেল ভাবিলেন,—যে বালক ভবিষ্যতে একটি রাজ্যের কর্ণধার হইবে তাহাকে গড়িয়া তোলা একটা কাজের মত কাজ। এই মনে করিয়া তিনি এই কার্য্যভার-গ্রহণে সম্মত হইলেন। তখন ছোটলাট বাহাদুর বলিলেন,—"দেখুন ছেলেটীকে নিজের ছেলের মত ভাবিবেন ; বিদ্বান্ বা খেলাধূলায় ও শিকারে সে ওস্তাদ হউক, ইহা আমি চাই না ; আমি চাই, তাহাকে আপনি প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিবেন।" মিষ্টার কিডেল উত্তর করিলেন,—"তাহাই করিব।" কটকে পৌঁছিযা মিষ্টার কিডেল দেখিলেন, তাঁহার ছাত্র শ্রীরামচন্দ্র পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্রের অভিভাবকতায় শিক্ষালাভ করিতেছেন। মিষ্টার কিডেল শ্রীরামচন্দ্রের অভিভাবক ও শিক্ষক হইবার পর গবর্মেণ্ট গোবিন্দচন্দ্রকে তাঁহার সহকারী-পদে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা তখনও ভাল হয় নাই। সেইজন্য মিষ্টার কিডেলকে তিনি প্রত্যূষে "গুড-ইভনিং স্যর" (Good-evening, sir) বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই শ্রীরামচন্দ্র ইংরেজী ভাষা এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ তাঁহার এইরূপ বিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভারত-সম্রাট সেজন্য তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। প্রথমে এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, মিষ্টার কিডেল পৃথক বাটীতে অবস্থান করিবেন এবং তথায় থাকিয়া ঢেঙ্কানলের ও ময়ূরভঞ্জের

নাবালক রাজা—উভয়েরই শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন কিন্তু এ ব্যবস্থা সন্তোষজনক হইল না; সুতরাং ঢেঙ্কানলের নাবালক রাজার মৃত্যু হইলে মিষ্টার কিডেল গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া ময়ূরভঞ্জ-রাজের কটকস্থিত বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসরকাল ময়ূরভঞ্জের তরুণ নৃপতি তাঁহার শিক্ষকের সহিত একই বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর আরও ছয় বৎসর পর্য্যন্ত মিষ্টার কিডেলের সহিত তাঁহার এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। নাবালক অবস্থায় শিক্ষাধীন থাকিবার কালে তরুণ মহারাজা কখনও তাঁহার শিক্ষকের আদেশ অবহেলা করেন নাই, অথবা বিন্দুমাত্র অসম্ভ্রম প্রদর্শন করেন নাই। এই সময়ে সাবানের প্রথম প্রচলন আরম্ভ হয়। হিন্দুরা প্রথমে সাবান ব্যবহারে আপত্তি করিয়াছিলেন। এমন কি, সাবান-ব্যবহারে জাতি যাইবে—এরূপ কথা পর্য্যন্ত ছোটলাটের নিকট বলা হইয়াছিল। তথাপি মিষ্টার কিডেল শ্রীরামচন্দ্রকে স্নানের সময়ে সাবান ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। অবশ্য তরুণ মহারাজা সাবান ব্যবহারের উপকারিতা বুঝিয়া সাবান ব্যবহার করিতেন। আর একটী উপদেশ সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার ইংরেজ শিক্ষকের মুখে শুনিতে পাইতেন; তাহা এই—মানুষ নিম্নজাতির ঘরে জন্মিলেও সে মানুষ, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে (Remember a man's a man, though he is of low caste)। সত্য সত্যই তরুণ মহারাজা ইহা মনে রাখিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে কোনও মানুষকেই তিনি ঘৃণা করিতেন না। তবে যে ব্যক্তি ঘৃণ্য কার্য্য করিত, তাহার উপর তাঁহার স্বতঃই ঘৃণার উদ্রেক হইত।

বাল্যে কৈশোরে শ্রীরামচন্দ্র বড় লাজুক, অল্পভাষী ও বিষণ্ণ ছিলেন; তাঁহার মুখ সর্ব্বদাই ভার হইয়া থাকিত। প্রাতঃকালে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিবার সময়ে তাঁহার শিক্ষক কিডেল সাহেব

তাঁহাকে পথে নানাপ্রকার শিক্ষণীয় বস্তু দেখাইতেন। প্রথম প্রথম এরূপভাবে তাঁহার মৌন ভঙ্গ করায় তিনি শিক্ষকের উপর বিরক্ত হইতেন বটে, কিন্তু পরে তিনি দর্শনীয় বিষয়গুলির উপর এরূপ দৃষ্টি রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে, পথে কোনও শিক্ষণীয় বস্তু শিক্ষকের দৃষ্টি এড়াইলে সেদিকে তিনি শিক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেন এবং এরূপ ঘটনা ঘটিলে তিনি যেন বিজয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। উত্তরকালে শ্রীরামচন্দ্র যে তীক্ষ্ণপর্য্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহার সূত্রপাত যে, এই সময়ে মিষ্টার কিডেলের দ্বারা হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিডেল সাহেবের পত্নী মিসেস কিডেলও তরুণ মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র-গঠনে অল্প সহায়তা করেন নাই। মিসেস কিডেল সুশিক্ষিতা, অতীব বুদ্ধিমতী এবং সৎসাহস-সম্পন্না ছিলেন। তাঁহার প্রভূত হৃদয়-বল ছিল। ময়ূরভঞ্জের দীন কুষ্ঠরোগীদিগের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থার জন্য তিনি মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় তিনি কিরূপ করুণহৃদয়া ও সহানুভূতিশালিনী মহিলা ছিলেন। উত্তরকালে কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এই আশ্রমের কর্ত্রী ছিলেন মিসেস কিডেল। মিসেস কিডেল সহানুভূতি ও করুণার প্রভাবে ময়ূরভঞ্জের অধিবাসীদিগের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিশোর মহারাজ শান্তস্বভাব ও অল্পভাষী ছিলেন এবং তাঁহার চিত্ত ছিল চিন্তাপ্রবণ। বাল্যকাল হইতেই তিনি অন্যান্য বালকদের মত খেলাধূলায় তেমন অনুরাগী ছিলেন না, তিনি ছিলেন পুস্তকের ভক্ত। পুস্তক-পাঠেই তাঁহার অধিক অনুরাগ দৃষ্ট হইত। কিন্তু তাঁহার অধ্যয়ন-লিপ্সা পাঠ্যপুস্তকপাঠেই পরিতৃপ্ত হইত না; তিনি বিভিন্নবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। তবে সাহিত্য ও ইতিহাস-পাঠেই তাঁহার সবিশেষ আনন্দ হইত।

অধ্যয়ন ও খেলাধূলা

মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র কৈশোরে উড়িয়া পাট্টা হইতে ময়ূরভঞ্জের বিবরণ—রাজ্যের উৎপত্তি হইতে তাঁহার পিতার পরলোক-গমনের সময় পর্য্যন্ত—ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহাকে তাঁহার প্রাথমিক সাহিত্য-সাধনার অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। বাল্যে ও কৈশোরে পুস্তকপাঠ এবং তরুণ যৌবনে শিক্ষাই ছিল তাঁহার অবসর-বিনোদনের বস্তু। কৈশোরেও তাঁহার শিকারে অনুরাগ নিতান্ত অল্প ছিল না। বাল্যে গ্রীম-প্রণীত উপকথার পুস্তক (Grimm's Fairy Tales) তিনি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে বহু দুঃসাহসিক ঘটনাবলীর বিবরণ-পূর্ণ পুস্তকাদিও তিনি অধ্যয়ন করেন। ইহার পরই তিনি জন ষ্টুয়ার্ট মিল ও হারবার্ট স্পেন্সারের পুস্তকপাঠে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময়ে তাঁহার শিক্ষকগণকে তিনি প্রশ্নের উপর প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিতেন।

পুস্তক-পাঠ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল; খেলা-ধূলা তাহার পর। ছেলেবেলায় এমন সকল খেলা তিনি করিতেন যেগুলিতে হৈ-চৈ হইত না; তাঁহার খেলাধূলা ঠাণ্ডা ধরণের ও গম্ভীর গোছের ছিল। খুব ছেলেবেলায় তিনি "কাছারী" "কাছারী" খেলা করিতেন। পাশার ঘুঁটি, খোলা-খাবড়া, কাগজ-চাপা ইত্যাদি হইত তাহার লোকবল। ইহাদিগকে তিনি আদালতের বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মচারী সাজাইতেন। নালিশ রুজু হইত, নালিশ শুনিয়া বিচারক অপরাধ লিপিবদ্ধ করিতেন; তার পর অপরাধীর সাজা হইত। বালক মহারাজার বিস্তর পায়রা ছিল ইহাদিগকে অপরাধী সাজানো হইত; সুতরাং বিচার ও দণ্ড ইহাদেরই হইত। একবার একটি পায়রার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, কিন্তু সে একবারমাত্র। ইহার পর তিনি যুদ্ধের খেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক হাজার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কাঠের পুতুল ছিল। অস্ত্রগুলি

ধাতুনির্ম্মিত ছিল। কয়েকটী পিতলের কামানও ছিল। এইগুলি ময়ূর-ভঞ্জের শিল্পীরাই তৈয়ারী করিয়াছিল। প্রায়ই বেলগড়িয়া প্রাসাদে ছাদের উপর তিনি এই পুতুলগুলিকে লইয়া যুদ্ধের খেলা করিতেন। বালক মহারাজার সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহাকেও তিনি এই খেলা দেখাইতেন না।

তরুণ মহারাজার অশ্বারোহণে তেমন আগ্রহ বা অনুরাগ ছিল না; তথাপি তিনি তাঁহার শিক্ষক মিষ্টার কিডেলের সহিত নিত্য অশ্বারোহণ করিতেন। বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক সময় ঘোড়ার পিঠেই কাটিয়া যাইত। এজন্য পরিণত বয়সে তিনি কার্য্যে একাগ্রতার পরিচয় দিতে পারিতেন। তিনি চড়িবার ঘোড়াগুলিকে বড় ভালবাসিতেন। রাভেন্‌সা কলেজের ফটকে ও অন্যান্য স্থানে তরুণ মহারাজের কতকগুলি অশ্ব উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিয়াছিল বলিয়া একবার উড়িষ্যার কমিশনার মহাশয় উহাদিগকে ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীরামচন্দ্র দার্জ্জিলিঙ্গে ছিলেন। তাঁহার নিকট কমিশনারের এই নিষেধাজ্ঞা যখন পৌঁছিল, তখন বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি ঐ ঘোড়াগুলি কি সত্য সত্যই রাখিতে চান? উত্তরে তরুণ মহারাজ বলেন—"এগুলিকে আমি রাখিতেই চাই, ইহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলে আমার মনে বড় কষ্ট হইবে।" বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী তখন মিষ্টার কিডেলকে বলেন,—"তবে ঘোড়াগুলিকে রাখিয়া দিন।" বলা বাহুল্য, পরে এই ঘোড়াগুলি বেলগড়িয়া প্রাসাদের আস্তাবলে থাকিয়া বুড়া হইয়াছিল।

প্রায় এই সময়ে তরুণ মহারাজা দার্জ্জিলিঙ্গ সহরে তাঁহার 'টম পিঞ্চ' নামক পুরাতন ঘোটকে চড়িয়া একটি পেপার-স্ক্রীন রেস (Paper-screen race জিতিয়াছিলেন। মিসেস কিডেল মহারাজার খেলাধূলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—একবার রাজধানী বারিপদাতে ইংরেজী নববর্ষের

দিনে মহারাজা 'Tilting at the ring" খেলায় প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। তিনি 'টম পিঞ্চে'র পিঠে চড়িয়া যখন সমস্ত রিং গুলি (rings) হস্তগত করেন, সেই সময়ে 'টম পিঞ্চ' হঠাৎ তাঁহাকে লইয়া দৌড় দেয় এবং উদ্দামগতিতে বিদ্যুৎবেগে আস্তাবলের দিকে ছুটিতে থাকে। তরুণ মহারাজা অবিচলিতভাবে উহার পিঠে বসিয়াছিলেন এবং যখন ঘোড়াটি দ্রুতবেগে আস্তাবল-ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে, তখন তিনি উহার পিঠে শুইয়া পড়িয়াছিলেন; নহিলে সোজা উঁচু হইয়া বসিয়া থাকিলে আস্তাবলের ফটকের মাথায় লাগিয়া তাঁহার মাথা গুঁড়া হইয়া যাইত।

রাভেন্‌সা কলেজের ছাত্রগণের জন্য যেরূপ খেলাধূলা নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেইসকল খেলা-ধূলায় তিনি যোগ দিতেন না; কারণ, তাঁহার খেলা-ধূলার ব্যবস্থা কলেজের বাহিরে ব্যবস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান ব্যায়াম ছিল—অশ্বারোহণ। তিনি টেনিস খেলিতেন মন্দ নয়, কিন্তু র‍্যাকেট খেলায় ওস্তাদ ছিলেন। তখনকার দিনে বালক-মহারাজাদিগের পক্ষে ফুটবল খেলা নিষিদ্ধই ছিল; তবে তরুণ মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র একটু আধটু ক্রিকেট খেলা করিতেন। তিনি খুব ভাল বিলিয়ার্ড খেলিতেন; কিন্তু অতিথিদের সম্মান রাখিবার জন্য এদেশীয় ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের খাতিরে কখনও তাঁহাদিগকে হারাইবার চেষ্টা করিতেন না। তিনি ইংরেজী ও দেশীয় দুই প্রকার পদ্ধতিতেই দাবা খেলিতে পারিতেন এবং তাহা ভালই খেলিতেন। কটকে তখন যে দুই চারিটী ইংরেজ বালক-বালিকা ছিল, মহারাজা তাহাদের সঙ্গে একত্র ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া এবং তাহাদের পার্টি বা আমোদ-প্রমোদে যোগ দিয়া তাহাদের সহিত ভ্রাতৃ-ভাবে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

তিনি শিকারের খুব অনুরাগী ছিলেন। খুব ছেলেবেলা হইতেই বন্দুক ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন। বহু বৎসর ধরিয়া শিকারই

তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ক্রীড়া ছিল। বিপুল সাহস তাঁহার একটি প্রধান গুণ ছিল। "স্যর জন লরেন্স" নামক জাহাজ যেবার সমুদ্রে সমস্ত আরোহীসহ ডুবিয়া যায়, সেইবারের অব্যবহিত পূর্ব্ববারে মহারাজা এই "স্যর জন লরেন্স"-যোগেই সমুদ্রপথে কটকে আসিতেছিলেন। পথে ভীষণ ঝড়ের মুখে জাহাজখানি পড়িয়াছিল। কিন্তু মহারাজা সেই বিষম বিপদে তাঁহার প্রকৃতিগত নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

তরুণ মহারাজা দেশ ভ্রমণ করিতে বড় ভালবাসিতেন; কিন্তু তাঁহার নাবালক অবস্থায় দেশভ্রমণের সময়ে যেরূপ জাঁকজমক ও সমারোহের সহিত উদ্যোগ-আয়োজন হইত তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার অভিভাবকের সহিত সমুদ্রপথে সিংহল-যাত্রা করেন। রাজ-পরিবারের দুই চারিজন লোকের প্ররোচনায় জাহাজ ছাড়িবার সময়ে সমস্ত ভৃত্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ পাচক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই বলিয়া তাঁহাকে খাদ্য-বিভ্রাটে পড়িতে হয় নাই। কলম্বোতে গিয়া নূতন একজন ভৃত্য তাঁহার জন্য নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল, সিংহল-যাত্রায় আনন্দ তেমন হয় নাই, কারণ মহারাজার বিখাজ (eczema) রোগ হয়। তথাপি সিংহলে পৌঁছিয়া তিনি কাণ্ডি ও সিংহলের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করেন। তাঁহার অসুস্থতার জন্য ভ্রমণের কাল কমাইয়া দেওয়া হয়। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলেও কলিকাতায় উপনীত হইয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। তাঁহার চক্ষুরোগ হইয়াছিল। চিকিৎসক তাঁহাকে একটি অন্ধকার ঘরে রাখিবার ও বই পড়া বন্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। তথাপি তিনি লুকাইয়া বই পড়িতেন। সেই জন্য রোগ সারিতেছিল না বলিয়া ডাক্তার ঔষধ দিয়া চক্ষের তারকা

কিছুদিনের জন্য বিস্তৃত (dilated) করিয়া দেন, তাহাতে পুস্তকপাঠ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইযাছিল।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃতি ছিল যেমন নম্র ও মধুর, অপরের প্রতি তাঁহার ব্যবহারও ছিল তেমনই নম্র ও মধুর। তিনি কখনও কাহারও উপর রূঢ় বা কর্কশ ব্যবহার করিতেন না; ক্রোধের বশে কাহারও প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতে কেহ কখনও তাঁহাকে দেখে নাই। অতি সামান্য তুচ্ছাদপি তুচ্ছ লোকেরও উপরও তিনি কখনও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না। কথা বা কার্য্য দ্বারা কাহারও মনে আঘাত দেওযা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। উড়িষ্যার বৃহত্তম রাজ-বংশের বংশধর তিনি, কিন্তু ঔদ্ধত্য বা অভিজাত-সুলভ দর্প-দম্ভ তাঁহাতে লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার সহপাঠী ও সহচরগণের প্রতি তাঁহার আচরণে বিনয, শিষ্টতা, সরলতা ও প্রীতি ফুটিযা থাকিত। তিনি বিশুদ্ধস্বভাব ছিলেন এবং আজীবন চারত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিযাছিলেন। রাজার ছেলে, তাঁহাকে অনেক প্রলোভনের ভিতরে থাকিতে হইত। তাহাব উপর অনেক রকমের কর্ম্মচারী ও ভৃত্য তাঁহার ছিল, যাহারা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তাঁহাকে হাত করিবার জন্য তাঁহাকে কুপথে লইযা যাইবার চেষ্টা করিযাছিল, কিন্তু এই সকল প্রলোভনের অগ্নিপরীক্ষা তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহার গায়ে পাপের আঁচ পর্য্যন্ত লাগে নাই।

এ সম্বন্ধে ময়ূরভঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত কলেক্টর বাবু রামনারায়ণ সারাঙ্গী—যিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হইতে যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিযাছিলেন—লিখিয়াছেন :—"ছেলেবেলা হইতেই শ্রীরামচন্দ্র বড় শান্ত-শিষ্ট ছিলেন। কখনও কোন ভৃত্যকে বা অপর কাহাকে তিনি কটু কথা বলেন নাই। উড়িষ্যার অধিকাংশ গড়জাত রাজ্যসমূহে কুচরিত্র লোকের অভাব পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই; পঁচিশ বৎসর

পূর্ব্বে অবস্থা আরও খারাপ ছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাজবাটীর ভৃত্য ও রাজবাটীতে গমনের অধিকারপ্রাপ্ত অন্যান্য কুস্বভাব ব্যক্তি বালক মহারাজাকে কুপথ-গামী করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিযাছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। শ্রীরামচন্দ্র সকল প্রকার প্রলোভন দমন করিয়া তাঁহার চরিত্র অক্ষুণ্ণ ও বিশুদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাবক মিষ্টার কিডেলও তাঁহার চরিত্র-গঠনে ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ-সাধনে বড় অল্প সহায়তা করেন নাই। ভগবানের অনন্ত করুণা যে, মিষ্টার কিডেলের মত অভিভাবক ও শিক্ষকের হস্তে বালক মহারাজকে মানুষ করিবার ভার ন্যস্ত হইযাছিল।

শ্রীরামচন্দ্র ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা ও দুই বৎসর পরে ফাষ্ট´ আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বি-এ শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পরীক্ষা দিবার জন্য বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ, এই দুই বিষয় শিক্ষা করিবার তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহার ইচ্ছাও ছিল যে, তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। রাজপরিবার ইহার বিরোধী হইলেন, কারণ তিনি বহুদিন প্রবাসে রহিয়াছেন এবং রাজ্যে অনুপস্থিত। গবর্মে´ণ্ট রাজপরিবারের ইচ্ছার প্রতিকূলে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন না; কাজেই গবর্মেণ্টের উপদেশে তাঁহাকে বি-এ পড়া বন্ধ করিতে হইল। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াই তাঁহাকে রাজকার্য্য-পরিচালনের জন্য প্রস্তুত হইতে এবং ময়ূরভঞ্জে উপস্থিত হইতে হইল।

তিনি সাবালক হইয়া ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ কটক হইতে বারিপদায় উপনীত হইলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিল। ইহার পরও শ্রীরামচন্দ্র মিষ্টার কিডেল ও শ্রীযুক্ত

মোহিনীমোহন ধর, এম-এ, বি-এল মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি মিষ্টার কিডেলের নিকট ইংরেজী সাহিত্য এবং ধরমহাশয়ের নিকট বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যসংক্রান্ত ও পারিবারিক কার্য্যের চাপ তাঁহার উপর এরূপভাবে আসিয়া পড়িল যে, তাঁহার অধ্যয়নে বাধা পড়িতে লাগিল। তথাপি তিনি বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। যখন তিনি কলিকাতায় বি-এ পরীক্ষা দিতে যাইলেন, তখন তাঁহার শিক্ষক মিষ্টার কিডেল পীড়িত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার যে সকল অনুচর তাঁহার সহিত গিয়াছিল তাহারা ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়। ইহাতে তাঁহার মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তি এতই বৃদ্ধি পায় যে, পরীক্ষায় সাফল্যলাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে; তথাপি পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা যায় যে, মাত্র সামান্য কিছু নম্বরের জন্য তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অক্ষম হইয়াছিলেন।

রাজ্যভার গ্রহণ

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে ক্রমশঃ দর্শন ও ব্যবহারশাস্ত্র (philosophy and law) অধ্যয়নেই তিনি প্রধানভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই দুইটী বিষয়ে তাঁহার প্রভূত অধিকার হইয়াছিল। তিনি ব্রিটিশ আইনশাস্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতেন ও উহার প্রশংসা করিতেন। ব্রিটিশ আইন সাম্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তিনি উহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ উহা তাঁহার রাজ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া তথায় ব্রিটিশ ভারতের শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি তাঁহার সমসাময়িক অবস্থা অপেক্ষা বহুদূর অগ্রগামী হইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ, শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বুদ্ধিতে, আদর্শে তিনি তাঁহার প্রজাগণের অপেক্ষা

বহু পরিমাণে উন্নত ছিলেন। রাজ্যের কল্যাণের জন্য তিনি যে সকল সংস্কার বা উন্নতি কল্পনা করিতে পারিতেন, প্রজাগণের মস্তিষ্কে সে সকল ধারণা করিবার শক্তিও তখন বিকশিত হয় নাই।

বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি

যখন শ্রীরামচন্দ্রের বয়স ১৮ বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার সহিত স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের গুণবতী তৃতীয়া কন্যার বিবাহের প্রস্তাব হয়। দার্জ্জিলিঙ্গ সহরে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত কেশবচন্দ্রের কন্যার সাক্ষাৎ হয় এবং সেই সাক্ষাতের ফলে তাঁহার মনে অনুরাগের সঞ্চার হয়। অনুরাগ প্রণয়ে পরিণত হয়। বিবাহের প্রস্তাব উঠিলে ইহা তরুণ মহারাজা এবং তদীয় শিক্ষক ও অভিভাবক মিষ্টার কিডেলের অনুমোদন লাভ করে। মহারাজা তাঁহাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দার্জ্জিলিঙ্গে বিবাহ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পাকাপাকি করিতে আসেন। যাহা হউক, বিবাহের প্রস্তাব প্রকাশ্যে রাজপরিবারকর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলেও, গোপনে মহারাজ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল এবং উভয়ের মধ্যে যে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা কয়েক বৎসর অটুট ছিল। কিন্তু জাতি-বর্ণ ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অনৈক্যের জন্য কেবল রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ কেন, ময়ূরভঞ্জের প্রজাবৃন্দও এইরূপ অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী হইয়াছিলেন। অবশেষে প্রজাগণের ইচ্ছানুসারে ও কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের উপদেশমতে মহারাজা বাধ্য হইয়া এই বিবাহের সঙ্কল্প মন হইতে দূর করিয়া দেন। প্রথম প্রণয়ের নিষ্ফলতায় তরুণ মহারাজা যে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, অবশেষে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামচন্দ্র ছোটনাগপুরের মহারাজা নীলমণি সিংহের পৌত্রী লক্ষ্মীকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের বয়স তখন ২৫ বৎসর। বিবাহের সময়ে লক্ষ্মীকুমারীর বয়স ছিল ১৬ বৎসর। তিনি অসামান্য

সুন্দরী এবং আদর্শ মহিলা ছিলেন। তিনি তাঁহার মধুর স্বভাব, শান্ত প্রকৃতি, পরহিতৈষণা, শিষ্ট ব্যবহার এবং করুণা ও সহানুভূতি দ্বারা সকলের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং এইসকল গুণে তিনি মহারাজেরও প্রীতির পাত্রী হইয়াছিলেন।

মহারাণী লক্ষ্মীকুমারীর মৃত্যু

এই বিবাহে তরুণ মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সুখ অতি অল্পকালমাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। মহারাণী লক্ষ্মীকুমারী দেবীর গর্ভে তিনটী সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমটী কন্যা—প্রস্ফুট গোলাপের মত সুন্দরী; ইঁহাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইতেন; ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই কন্যার জন্ম হয়। দ্বিতীয় সন্তান—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে ভূমিষ্ঠ হয়েন; ইঁহার নাম টিকাইত পূর্ণচন্দ্র; ইনি জন্মগ্রহণ করিলে রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া যথেষ্ট উৎসব ও সমারোহ হইয়াছিল। তৃতীয় সন্তান—ছোটরায় প্রতাপচন্দ্র, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না এবং শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। ভাগ্যও ইঁহার নিতান্ত মন্দ—কারণ, অতি শিশু অবস্থায় মাতৃদেবী মহারাণী লক্ষ্মীকুমারী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পরলোকগমন করেন। যে দুরন্ত বসন্তরোগে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় মহিষী কালকবলে পতিত হইয়াছিলেন, সেই কাল বসন্তরোগে মহারাণী লক্ষ্মীকুমারীরও মৃত্যু হয়। ইঁহার মৃত্যুতে মহারাজা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়েন। এই শোকের আঘাত সামলাইয়া উঠিতে তাঁহার বহুদিন লাগিয়াছিল। মহারাণীর মৃত্যুর পর মহারাজা সকল প্রকার ভোগ ও বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়াছিলেন; মৃগয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন; মাংস এবং ভোজন-বিলাস পরিহার করিয়াছিলেন। খুব সাদাসিদা আহার তিনি করিতেন এবং অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে থাকিতেন।

মহারাণীর স্মৃতি-রক্ষা

মহারাণী লক্ষ্মীকুমারীর স্মৃতি-রক্ষার জন্য ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'লক্ষ্মীকুমারী ধর্ম্মশালা'' প্রতিষ্ঠিত হয়। বারিপদা নগরীতে কোনও অপরিচিত ব্যক্তি বা পর্য্যটক আগমন করিলে এই ধর্ম্মশালায় তিনি আশ্রয় লাভ করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত 'রাণীবাগ' নামক একটী সুন্দর বাগানও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত তৈয়ারী করা হয়। এই বাগানের ভিতরে একটি মর্ম্মর স্তম্ভও তাঁহার পুণ্যস্মৃতির দ্যোতক। এই স্তম্ভগাত্রে মহারাণীর উদ্দেশে একটি বাঙ্গালা কবিতা খোদিত আছে।

'মহারাজা'-উপাধি-প্রাপ্তি

১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীরামচন্দ্র রাজকার্য্যে ব্রতী হয়েন। তিনি পূর্ণভাবে রাজ্যশাসনব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন এবং এরূপ যোগ্যতার সহিত রাজকর্ত্তব্য পালন করিতে থাকেন যে, দশ বৎসরেই তাঁহার সুশাসন ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রতি ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হয। এই দশ বৎসরে তিনি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের এরূপ উন্নতি সাধন করেন যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাঁহার যোগ্যতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার প্রজাবৃন্দ শিষ্টাচার-হিসাবে তাঁহাকে মহারাজা বলিয়াই সম্বোধন করিত; কিন্তু এইবার তাঁহারা অবাধে তাঁহাকে মহারাজা বলিয়া সম্বোধন করিবার অধিকারী হইল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক-উপলক্ষে এই উপাধির সনন্দ তাঁহাকে দেওয়া হয। বাঙ্গালার তদানীন্তন অস্থায়ী ছোটলাট স্যর জেম্‌স এ বোর্ডিলন বেলভেডিয়ার প্রাসাদে শ্রীরামচন্দ্রকে 'মহারাজা'-উপাধির মানপত্র প্রদান করিবার সময়ে বলেন :—"আপনার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ-লাভের পূর্ব্বে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট বাহাদুরের

মুখে প্রায়ই আপনার প্রশংসাবলী শুনিতাম। তিনি আজ উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে এই মানপত্র আপনাকে প্রদান করিতে পারিলে এবং এই নূতন উপাধি-সমন্বিত নামে আপনাকে সম্বোধন করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইতে পারিতেন। আপনি যে উড়িষ্যার গড়জাত রাজ্য-সমূহের রাজগণের অগ্রণীস্বরূপ রাজ্যশাসন করিতেছেন এবং রাজকীয় কার্য্যে ও ব্যক্তিগত জীবনে যে প্রশংসনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিয়া আমি সন্তোষলাভ করিয়াছি। আপনি যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন সেই সময়ে আপনার ন্যায় শিষ্ট, শিক্ষালাভে আগ্রহশীল, সচ্চরিত্র ছাত্রের ভার গ্রহণ করিয়া গবর্মেণ্ট গৌরব অনুভব করিতেছেন। ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবার সময় হইতে এ যাবৎ আপনি এই রাজ্যকে সুশাসিত করিয়াছেন এবং আপনার দান ময়ুরভঞ্জের সীমা অতিক্রম করিয়া সুপ্রকট হইয়াছে ; এই দান বিপুল সহৃদয়তা ও সুশিক্ষার পরিচায়ক। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে যে দরবার হইয়াছিল তদুপলক্ষে আপনার পিতা 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং আমার ও আপনার বহু শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর গভীর আনন্দের বিষয় এই যে, আপনিও তদনুরূপ—কিন্তু তদপেক্ষা সমা-রোহকর অনুষ্ঠান উপলক্ষে একই প্রকার উপাধিতে বিমণ্ডিত হইলেন। আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া এই উপাধি ভোগ করিতে থাকুন।"

দ্বিতীয়বার বিবাহ

মহারাণী লক্ষ্মীকুমারীর মৃত্যুর পর মহারাজা প্রায় তিন বৎসর অত্যন্ত বিমর্ষ অবস্থায় কালযাপন করিয়াছিলেন। মহারাণীর মৃত্যুতে তিনি কেবল চিন্তা করিতে থাকেন, কেন বিধাতার এত বড় দণ্ড তাঁহার উপর নিপতিত হইল। এই সময়ে কেবল যে মহারাণীর শোকেই তিনি মর্ম্মব্যথা অনুভব করিতেন তাহা নহে, আর একটী চিন্তাও তাঁহার

হৃদয়ে সূচীবেধ্য যাতনার সঞ্চার করিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই এই ভাবিয়া কাতর হইতেন যে, যাঁহাকে তিনি বিবাহ করিব বলিয়া বাক্‌দান করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি—সেই তরুণী মহিলার প্রতি তিনি ঘোর অবিচার করিয়াছেন। বিশেষতঃ মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যে অসামান্য অনুরাগ ছিল তাহা স্মরণ করিয়া মহারাজ বড়ই ব্যথা অনুভব করিতেন। এই তরুণী মহিলা সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। মহারাজের সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইলেও কয়েকটী সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে তাঁহার সুম্বন্ধ আসিয়াছিল; কিন্তু তিনি সে সকল প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটা যেমন সর্ব্বদাই উত্তরমুখে থাকে, তাঁহার হৃদয়ও তেমনই একমাত্র মহারাজা শ্রীরাম-চন্দ্রের অনুরাগী ছিল। তিনি দেহ-মন-প্রাণ সকলই তাঁহার বাঞ্ছিত শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিলেন। মহারাজার সহিত লক্ষ্মী-কুমারী দেবীর বিবাহের পর হইতে তিনি প্রায় চৌদ্দ বৎসর কাল নীরবে তাঁহার বাঞ্ছিতের উদ্দেশে প্রেমাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন। তরুণী মানসীর এই একনিষ্ঠ তপস্যায় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি তখন সঙ্কল্প করিলেন—তাঁহার বাক্‌দত্তা প্রণয়া-স্পদার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে তাহার সংশোধন করিতে হইবে। কিন্তু এই সঙ্কল্পসিদ্ধির পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এই বিবাহে পূর্ব্ববৎ প্রতিকূলতা বিদ্যমান ছিল। জাতি, ধর্ম্ম ও সামাজিক মর্য্যাদাদি এই বিবাহের বিরোধী হইয়াছিল। একদিকে ময়ূরভঞ্জের প্রজাবৃন্দ এই কারণে এই বিবাহে সম্মতি দান করিতেছিল না এবং অপর দিকে ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দ পণ করিয়া বসিলেন যে, পাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলে এ বিবাহ হইতেই পারে না। তাহার উপর আইনের দিক দিয়াও যথেষ্ট ভাবিবার বিষয় ছিল,—এ বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ হইবে কি না অর্থাৎ এই বিবাহের ফলে যে সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিবে তাহারা

বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে কি না। এই ব্যাপার লইয়া সে সময়ে প্রবল আন্দোলন উঠিয়াছিল। এই সময়ে মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার দেওয়ান শ্রীযুত মোহিনীমোহন ধর মহাশয়কে ইংরেজী ভাষায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্রে এই বিবাহে তাঁহার দায়িত্বের বিষয় পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। সেই পত্রের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—"ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আমি শক্তি সঞ্চয় করিয়াছি এবং বাধা যেরূপ প্রবল হইবে মনে করিয়াছিলাম, তদ্রূপ হয় নাই। আমার পক্ষে ন্যায় ও কর্ত্তব্য বিদ্যমান। আমি প্রজাবৃন্দের মনোভাব বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আমি যে সমস্যায় পড়িয়াছি তাহার সমাধান কোথায় ? একদিকে প্রতিশ্রুতি ও ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার, অন্যদিকে প্রজাবৃন্দের প্রতিকূলতাচরণ ? ধর্ম্ম ও নীতি কি বিষয়-বুদ্ধির নিকট পরাজিত হইবে ? প্রজাগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি হইতে বঞ্চিত হওয়া আত্মবিসর্জ্জনের তুল্য, কিন্তু এক্ষেত্রে কি ইহাই ধর্ম্ম নহে ? আমি শান্তিপূর্ণ জীবনই ভালবাসি, কিন্তু অবস্থার উপর আমার কোনও হাত নাই। অবশ্য আমার প্রজাবৃন্দকে না জানাইয়া আমি এই বিবাহ করিব না, যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে আমার মতে আনিবার চেষ্টা করিব। যদি তাহারা এই বিবাহের অনুমোদন না করে, তাহা হইলে অন্ততঃ পক্ষে আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া ইহা 'রহিয়া সহিয়া' লইতে হইবে। অবশ্য জনমণ্ডলীকে আমার মতানুবর্ত্তী করাই আমার কর্ত্তব্য এবং তাহাতে আমার উপকারই হইবে ; তবে ইহা কতদূর সম্ভব হইবে তাহা বলিতে পারি না। এই ত অবস্থা এবং এ সম্বন্ধে আমার অভিমত কি তাহাও আপনাকে বলিলাম। আপনি এ বিষয়ে কিরূপ অভিমত পোষণ করেন ? কারণ আপনার অভিমতকে আমি বারিপদা বা অন্য কোনও স্থানের কোনও ব্যক্তির অভিমতকে আমি অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া শ্রদ্ধা করি !"

বিবাহের পর মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র ইংরেজী ভাষায় লিখিত আর একখানি পত্রে দেওয়ান বাহাদুরকে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন—"আমি যে কার্য্য করিয়াছি তাহাতে ভয়ের কারণ কিছুই নাই, তথাপি ইহার দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইতেছি। আমি এই ব্যাপারে জনগণের সম্মতি-লাভের আকাঙ্ক্ষা করি নাই। আমি কেবল চাহিয়াছিলাম তাহাদের সহিষ্ণুতা; আমার মনে হয়, উহা প্রায় কার্য্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমি তাহাদের মনোভাব বেশ বুঝিতে পারিতেছি; যদি আমার অবস্থা তাহাদের মত হইত, তাহা হইলে তাহারা যাহা করিয়াছে আমিও তাহাই করিতাম, অবশ্য তাহা অপেক্ষা মন্দ কিছু করিতাম না। আমি তাহাদের মনের অবস্থা ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছি বলিয়াই আমার উদ্বেগ আরও অধিক হইতেছে, নহিলে হয়ত হইত না।"

উপরে উদ্ধৃত পত্র দুইটি হইতে মহারাজের মনের ভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রকট হইয়াছে। মহারাজা বুঝিয়াছিলেন যে, ন্যায় ও কর্ত্তব্য তাঁহার পক্ষে। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রজাবৃন্দের অসম্মতিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই ব্যাপারে তাঁহাকে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রজাবৃন্দের শ্রদ্ধা ও প্রীতি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। ইহা একটি অগ্নিপরীক্ষা। দুইটী বিরুদ্ধ ভাবের সংঘর্ষে তাঁহার হৃদয়ে প্রবল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল। অবশেষে তিনি বৈষয়িক নীতিকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া এই বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। বিপুল আত্মত্যাগের বেদীর উপর তাঁহার দ্বিতীয় বারের উদ্বাহকার্য্য প্রতিষ্ঠিত। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে এই বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। এই বিবাহ ময়ুরভঞ্জরাজ্যের প্রজামণ্ডলীর পূর্ণ অনুমোদন কখনই লাভ করে নাই।

ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট লাইট রেলওয়ের উদ্বোধন—

ময়ূরভঞ্জে স্যর এনড্রু ফ্রেজার

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট লাইট রেলওয়ের উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোট লাট স্যর এনড্রু ফ্রেজার ও তদীয় মহিষী লেডী ফ্রেজার সপারিষদ্ ময়ূরভঞ্জরাজ্যে পদার্পণ করেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোনও ছোটলাট ময়ূরভঞ্জরাজ্যে পদার্পণ করেন নাই। রাজধানী বারিপদায় ইঁহাদের আবাস-স্থল নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ছোটলাট বাহাদুরের অভ্যর্থনার জন্য মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। সমস্ত সহর পুষ্প-পল্লব-পতাকায় সুসজ্জিত ও রাত্রিতে দীপমালা-বিভূষিত হইয়াছিল। অপর-দিকে ময়ূরভঞ্জরাজ্যেও এই রেলপথের মত এরূপ বিরাট সাধারণ-হিতকর কার্য্যে আর কখনও কোন মহারাজা হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই সুবৃহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য এই বিরাট্ অনুষ্ঠানের আয়োজন ময়ূরভঞ্জ-রাজের পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল। বেলা দশটার সময়ে প্রথম ট্রেণ বারিপদা নগরীতে উপস্থিত হইলে মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ছোটলাট স্যর এনড্রু ফ্রেজারকে রেলপথ উদ্বোধন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই উপলক্ষে তিনি বক্তৃতা করেন, তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, ১৯০০-০১ খৃষ্টাব্দে এই রেলপথ-নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়। ময়ূরভঞ্জের অধিবাসীদিগকে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের ষ্টেশনে যাইবার সুবিধা-প্রদানের জন্যই এই রেলপথ-নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছিল। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে জমি জরিপ করা হয়, নক্সা তৈয়ারী হয় এবং কত টাকা আনুমানিক ব্যয় হইবে স্থির হয়, এবং এই সমস্ত বিষয় ভারত গবর্মেণ্টের নিকট পেশ করা হইয়াছিল। ১৯০২-০৩ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্মেণ্ট এই রেলপথ-নির্ম্মাণে সম্মতি

দান করেন এবং রেলপথ-নির্ম্মাণের কার্য্য ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের চল্‌তি রাজস্ব হইতেই রেলপথ-নির্ম্মাণের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইযাছে। ৩২ মাইল রেলপথ-নির্ম্মাণের আনুমানিক ব্যয় ৬ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এ যাবৎ খরচ হইয়াছে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। আশা করা যাইতেছে যে, খরচা ৬ লক্ষ টাকার উপর যাইবে না। এই রেলপথে শতকরা ৩০৪৫ টাকা আয় হইবে। আয সামান্য বটে ; আমরা আপাততঃ এই আয়েই সন্তুষ্ট। তবে এই রেলপথের দ্বারা এই রাজ্যের অরণ্যজাত দ্রব্যসমূহের ও অন্যান্য সামগ্রীর ব্যবসায় বিস্তৃতি লাভ করিবে। এমন কি, রেলপথের আয়ে যদি এক্ষণে উহার ব্যয়নির্ব্বাহ হয়, তাহাতেই আমরা তৃপ্ত হইব। আমরা রেল-পথের আয় দ্বারা লাভবান্ হইতে চাহি না, আমরা চাহি—ইহা দ্বারা রাজ্য সমৃদ্ধিশালী হউক। ময়ূরভঞ্জরাজ্যের ইঞ্জিনীয়ার মিষ্টার আরনল্ড মার্টিনের উপর এই রেলপথের জরিপ, নক্সা ও নির্ম্মাণভার ন্যস্ত হইয়াছিল। এই বিষয়ে তাঁহাকে রাজ্যের পূর্ত্তবিভাগের নিম্নতন কর্ম্মচারিগণ সাহায্য করিয়াছেন। রেলপথের জন্য ইউরোপ-জাত দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়াছেন মেসার্স বামারলরি এণ্ড কোং, মেসাস মার্টিন এণ্ড কোং এবং মেসার্স ওরেনষ্টীন এণ্ড কোপেল। কাথিবাড়-রাজকোটের কণ্ট্রাক্টর মেসার্স হেমচাঁদ এণ্ড ধরসি রেলপথ-নির্ম্মাণের চুক্তি লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের উপর ন্যস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ইহারা সকলেই আমার ধন্যবাদভাজন।"

ছোটলাট বাহাদুর রেলপথ-উদ্বোধন-কালে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"ময়ূরভঞ্জরাজ্যে আগমন করিয়া এবং এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। ময়ুরভঞ্জরাজ্যকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি এইজন্য যে, এমন একজন মহারাজা ইহার কর্ণধার হইয়াছেন যিনি ভোগ-বিলাসে মত্ত না থাকিয়া রাজ্যের কল্যাণ

ও উন্নতি-সাধন এবং সমৃদ্ধি-বর্দ্ধনে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। এরূপ একজন সুশাসক পাওয়া রাজ্যের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। বর্ত্তমান মহারাজার শাসনাধীনে রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমি আশা করি, মহারাজা যে সুযোগ লাভ করিয়াছেন তিনি তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবেন। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া রাজ্যের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী থাকুন।"

এইদিন অপরাহ্নে ছোটলাট বাহাদুর বারিপদা উচ্চ ইংরেজী স্কুলের পারিতোষিক-বিতরণ-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং লেডী ফ্রেজার তৎপরদিন বালিকা-বিদ্যালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। এই দুই ঘটনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উচ্চ ইংরেজী স্কুলের সংলগ্ন ছাত্রাবাসের নাম "ফ্রেজার হোষ্টেল" এবং বালিকা বিদ্যালযটীর নাম "লেডী ফ্রেজার বালিকা বিদ্যালয়" রাখা হয়।

২রা ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময়ে স-পারিষদ্ ছোটলাট বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত রাজবাটীতে একটি সান্ধ্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয। এই সম্মিলনে নীলগিরির রাজা, বালেশ্বরের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে ও কণিকার রাজা এবং সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারি-বৃন্দ যোগদান করেন। এই সান্ধ্য-সম্মিলনে ছোটলাট বাহাদুর ও তদীয় মহিষীর স্বাস্থ্যোন্নতি-কামনায় পানের প্রস্তাব উত্থাপন-প্রসঙ্গে মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। উহার মর্ম্ম এই ঃ—

"মান্যবর ছোটলাট বাহাদুর, মহিলাবর্গ ও ভদ্রমহোদয়গণ! এখানে আমি সম্মানভাজন অতিথিবর্গের স্বাস্থ্যের কল্যাণ-কামনায় আনন্দের সহিত পান-প্রস্তাব করিতেছি, আশা করি আপনারা সকলে এই প্রস্তাব উৎসাহ ও প্রীতির সহিত গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ছোটলাট বাহাদুর ও তদীয় পত্নীকে অভ্যর্থিত করিবার এবং ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের প্রতি আমি যে শ্রদ্ধা-ভক্তি অন্তরে পোষণ করি তাহা প্রকাশ

করিয়া বলিবার সুযোগ পাইয়া আমি আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতেছি।”

“এ দেশে রাজভক্তি ধর্ম্মের অনুশাসন মধ্যে গণ্য। সকল স্থির-চিত্ত ভারতবাসীর হৃদয়েই রাজভক্তি বিদ্যমান। ব্রিটিশ শাসনে এ দেশের বহু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে বলিয়া ব্রিটিশ রাজের প্রতি ভক্তি আমাদের অধিক। আমার সম্বন্ধে আমি বলিতেছি যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে যে সকল উপকার পাইয়াছি সেজন্য তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অত্যন্ত অধিক। আমার পিতার মৃত্যুর পর ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আমার ও আমার শিক্ষা প্রভৃতির জন্য যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন এবং আমার প্রতি যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে আমি বিশেষভাবে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আমি অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকিবার সময়ে ময়ূরভঞ্জরাজ্যের শাসন-ভার ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা রাজ্যের কল্যাণকর যেসকল ব্যবস্থাদির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই-গুলিকে আদর্শ করিয়া আজ আমি রাজ্যের অধিকতর কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইতেছি। আরও, আমার রাজ্য-শাসনে উড়িষ্যার করদরাজ্যসমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের নিকট আমি প্রায়ই মূল্যবান্ উপদেশ ও সাহায্য পাইয়াছি এবং এই উপদেশ ও সাহায্যই রাজ্যশাসনে সাফল্য-লাভের আংশিক হেতু। এই সকল কারণে আমার মনে মনে অভিলাষ ছিল যে, ছোটলাট বাহাদুরকে বারিপদাতে আমন্ত্রিত করিয়া লইয়া আসিয়া সম্বর্দ্ধিত করিব এবং সম্রাটের প্রতিনিধি-হিসাবে তাঁহার নিকট সেই সময়ে প্রকাশ করিয়া বলিব—ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নিকট আমি কতদূর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। আমার সেই অভিলাষ আজ পূর্ণ হইল। আমি বাগ্মী নহি, এমন কি সামান্য বক্তৃতাশক্তিও আমার নাই। সুতরাং আমার মনোভাব

প্রকাশের জন্য আমার কথাগুলিকে অনর্থক বাড়াইতে চাহি না। ভদ্রমহোদয়গণ, এক্ষণে আমি আমার সম্মানভাজন অতিথি স্যর এনড্রু ও লেডী ফ্রেজারের স্বাস্থ্যের কল্যাণ-কামনা করিতেছি।”

মহারাজার একমাত্র কন্যার মৃত্যু

মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের একমাত্র কন্যা শ্রীপদমঞ্জরী যেমন অপরূপ সুন্দরী, তেমনই গুণবতী ছিলেন। ৭।৮ বৎসর বয়সে ইংরেজীতে অনর্গল কথা কহিতে পারিতেন; বারিপদা হাই স্কুলের পারিতোষিক-বিতরণ-উপলক্ষে সভাপতি স্যর এনড্রু ফ্রেজার ও অন্যান্য মাননীয় অতিথিবর্গের সম্মুখে শ্রীপদমঞ্জরী একটী ইংরেজী কবিতা এরূপ সুন্দর আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং উহার উচ্চারণ পর্য্যন্ত এরূপ শুদ্ধ হইয়াছিল যে, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ইঁহার টাইফয়েড রোগ হয়। কলিকাতা হইতে ভাল ভাল ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করানো হয়। রোগ প্রথমে সারিয়া যায়। কিন্তু পরে আবার আক্রমণ করে। তাহাতেই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে শ্রীপদমঞ্জরীর মৃত্যু হয়। ইঁহার মৃত্যুতে মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার এই প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় কন্যাটীকে শেষ চুম্বন করিয়া শোকাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু একটু পরেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া, শোকের বেগ সংযত করিয়া তিনি তাঁহার অফিস-ঘরে চলিয়া আসেন এবং সজলনয়নে কলিকাতা হইতে আগত ডাক্তারগণের পারিশ্রমিকের জন্য চেক সহি করিয়া দেন। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জনে শোক প্রকাশ করিতে থাকেন। কিছুদিনের জন্য শোকে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি স্থিরভাব অবলম্বন করেন। তিনি বলিতেন,—শোকে আমার হৃদয়

ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বটে ; বিধাতার বিধানের উপর হাত নাই এবং তিনি যাহা করেন তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। তাঁহার সকল কার্য্যেই তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভগবদ্‌বিশ্বাস ছিল বলিয়া এত বড় শোকও তিনি জয় করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার আট মাস পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত একেশ্বরবাদী সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি শ্রীভগবানের বিধানে পূর্ণ বিশ্বাস ও আশার বাণী শুনাইযাছিলেন। শোক-তাপ-গ্রস্ত মনুষ্যের কর্ণে শ্রীভগবানের আশা ও আশ্বাস-বাণী প্রবেশের কথা তিনি গভীর বিশ্বাসের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মহারাজার চরিত্র-বলের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীপদমঞ্জরীর স্মৃতিরক্ষার জন্য মহারাজা বারিপদা কুষ্ঠাশ্রমে একটি প্রস্তর-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর তারিখে ভারত ও প্রাচ্যদেশসমূহের কুষ্ঠরোগীদিগের মিশনের অধ্যক্ষ মিষ্টার ডব্লিউ সি বেলির পত্নী ময়ূরভঞ্জ-পরিদর্শনে আগমন করেন ; সেই সময়ে তিনি এই প্রস্তর-স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিযাছিলেন। শ্রীপদ-মঞ্জরীর পুণ্যস্মৃতি বারিপদার একটি রোগ-সেবা রূপ পুণ্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে বলিয়া বড়ই শোভন হইযাছে।

কুষ্ঠাশ্রম

এই প্রসঙ্গে বারিপদার কুষ্ঠাশ্রমের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে কয়েকটী খড়ের চালা ঘর মাত্র ইহার সম্বল ছিল। উহাতেই মিস জে-এম গিলবার্ট কুষ্ঠরোগীদিগকে রাখিয়া তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিতেন। তার পর ১৯০৭ সালে মহারাজা কুষ্ঠাশ্রমের জন্য বারিপদা হইতে প্রায়

এক ক্রোশ দূরে আলোক ও বায়ুচলাচল-বিশিষ্ট ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ করাইযা দেন। কুষ্ঠরোগীরা তথায় পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে থাকে এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হয। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই উহা আশ্রমের অনারারী সেক্রেটারী মিসেস কিডেলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি এই কুষ্ঠাশ্রমের প্রাণস্বরূপিণী ছিলেন। এক্ষণে বারিপদার কুইন্সল্যাণ্ড মিশনের মিস এল্যানবী এই কুষ্ঠাশ্রমের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন। বন্যায়, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে যখনই উড়িষ্যাবাসিগণ বিপন্ন হইয়া থাকে, তখনই এই করুণহৃদয়া মহিলা করুণার প্রতিমূর্ত্তিরূপে তাহাদিগের সেবায় ব্রতী হয়েন।

শাসন-ক্ষমতা বৃদ্ধি

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেন ; সেই সময়ে তাঁহার ক্ষমতা সঙ্কীর্ণ ছিল। সেই সময়ে একজন করদ রাজা শাসন-ব্যাপারে কতটুকু ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন তাহার কোনও নির্দ্দেশ ছিল না। গবর্মেণ্টের নিকট প্রত্যেক করদ-রাজার ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য আবেদন করা হয। ফলে প্রত্যেক করদ-রাজ্যের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রদত্ত সনদে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়াও হয। মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের উপর পূর্ব্বে যে ক্ষমতা অর্পিত ছিল তিনি তাহা অভিজ্ঞতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং আইনে ও আইন-প্রয়োগেও তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহার ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়া দেন এবং ফলে তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে দায়রা-জজের ক্ষমতা লাভ করেন। ইহাতে মহারাজা স্বয়ং সন্তুষ্ট হয়েন এবং তাঁহার প্রজাগণও সন্তোষ লাভ করে। গবর্মেণ্টের অনুমোদনক্রমে এই ক্ষমতা ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের রাজকীয় বিচারপতি শ্রীযুত হরিদাস বসু, বি-এল্ মহাশয়ের

উপরও অর্পিত হয়। অতঃপর সকল প্রকার জটিল ফৌজদারী মামলার আপীল-বিচার রাজকীয় বিচারপতি ও জুডিসিয়াল কমিটির প্রেসিডেন্ট-রূপে মহারাজা স্বয়ং করিতে আরম্ভ করেন।

পুত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থা

এই সময়ে মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র তাহার পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার অধিকতর সুব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হয়েন। এতদিন কুমারদ্বয় গৃহেই সকল বিষয়ের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; ইংরেজী ভাষাতেও তাঁহাদের বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল। বারিপদায় থাকিয়া এবং স্বাস্থ্যলাভের জন্য কখনও হাজারীবাগে ও কখনও দার্জ্জিলিঙ্গে থাকিয়া তাঁহারা এতদিন শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। মহারাজা এক্ষণে তাঁহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিলেন— যে শিক্ষা লাভ করিয়া তাহারা জীবনের গুরুদায়িত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন এবং প্রকৃত মানবোচিত গুণসম্পন্ন হইতে পারেন। এই বিষয়ে বিশেষরূপ বিচার-বিবেচনা করিয়া তিনি শিক্ষালাভার্থ কুমারদ্বয়কে তাঁহাদের পিতৃব্য-পুত্রের সহিত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই আজমীরের মেয়ো কলেজে প্রেরণ করিলেন। শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার ইঁহাদের অভিভাবক ও শিক্ষকরূপে এবং পণ্ডিত দীনবন্ধু কর উড়িয়া-শিক্ষকরূপে ইঁহাদের সহিত গমন করেন। মহারাজা ব্যবস্থা করিলেন যে তাঁহার দুই পুত্র কলেজের একজন ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত একত্র অবস্থান করিবেন এবং হিন্দুর আচারধর্ম্ম যথাযথভাবে পালন করিবেন। কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তাঁহারা ইংরেজ বালকের মত শিক্ষালাভ করিবে। কারণ, মহারাজার ধারণা ছিল যে, এইভাবে শিক্ষিত হইলে তাঁহাদের চরিত্রের দৃঢ়তা জন্মিবে, তাঁহারা শিষ্টাচার ও ভদ্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবেন।

মহারাজা তাঁহার পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয় মনোনয়ন এবং যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পরে তাহার সুফল ফলিয়াছিল। কুমারদ্বয় উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রই হইয়াছিলেন।

পৃথিবী-ভ্রমণ

মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের মনে বহুদিন হইতেই পৃথিবী-ভ্রমণের সঙ্কল্প ছিল। রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা ও পুত্রদ্বয়ের শিক্ষাবিধানের বন্দোবস্তের জন্য এতদিন এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। পৃথিবীর সভ্য-দেশসমূহে উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে তাহাদের আচার-ব্যবহার, কর্ম্মশীলতা, তাহাদের দেশশাসনের পদ্ধতি, তাহাদের দেশের লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান-সমূহ দর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যই তিনি এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বৃথা কৌতুক-নিবারণের জন্য বা আমোদ-প্রমোদের জন্য তিনি দেশভ্রমণের সঙ্কল্প করেন নাই।

এই সঙ্কল্প-সাধনের জন্য তিনি পৃথিবী-ভ্রমণের একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে তিনি তদীয় রাজ্যের প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ আইচ, এল-এম-এস এবং কতিপয় অনুচর ও ভৃত্য লইয়া জাপান যাত্রা করেন। তিনি ২৫শে মে তারিখে হংকংএ উপনীত হয়েন এবং ২৭শে মে তারিখে তথাকার গবর্ণরের সহিত জলযোগ করেন। চীন সম্বন্ধে কতক আভাস পাইবার জন্য তিনি ২৮শে মে তারিখে কাণ্টন নগর পরিদর্শন করেন এবং তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হংকংএর ধনকুবের কোম্পানীর কাগজের দালাল স্যর হরমুশজি মোডির আতিথ্য গ্রহণ করেন। ৩রা জুন তারিখে মহারাজা হংকং দ্বীপের গভর্ণরের সহিত একত্র ভোজন করেন এবং ৪ঠা জুন সাংহাই যাত্রা করেন। ৯ই মে তারিখে নাগাসাকি ও ১৩ই জুন তারিখে ইয়কো-হামায় উপস্থিত হয়েন। তথা হইতে তিনি জাপানের রাজধানী টোকিও

সহরে গমন করেন এবং ১৫ই জুন তারিখে তথায় উপস্থিত হইলে ইণ্ডো-জাপানিজ এসোসিয়েসনের সদস্যগণ তাঁহাকে সদলবলে অভ্যর্থিত করেন। স্যর ক্লড ম্যাকডোনাল্ড মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও উভয়ে উভয়কে আপ্যায়িত করেন। তথায় দশদিন অবস্থান করিয়া তিনি বহু প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। ১৬ই তারিখে তিনি টোকিয়ো টেকনিক্যাল স্কুল, কমার্শিয়াল মিউজিয়াম ও সাবিজির পশ্চিম হংওয়ানজির মন্দির পরিদর্শন করেন। পরদিন মহারাজা নারীবিদ্যালয়, অভিজাত-সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়, (Peer's School), আচার্য্য কোনোর জুজুৎসু বিদ্যালয় (Professor Kono's Jujitsu School) এবং বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিষয়ক উদ্যান পরিদর্শন করেন। ১৮ই তারিখ বৈকালে তিনি নিক্কো দর্শনার্থ গমন করেন এবং তথাকার মন্দির-সমূহ, কেগোন জলপ্রপাত, চুজেঞ্জি হ্রদ ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তু পরিদর্শন করিয়া ১৮ই তারিখে টোকিও সহরে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। ২৩শে তারিখে তিনি রাজকীয় যাদুঘর (Imperial Museum) এবং কোবুকিজাতে জাপানী থিয়েটারে অভিনয় দর্শন করেন। ২৪শে তারিখে তিনি সিভিল ও মিলিটারী মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন।

২৪শে তারিখে কাউণ্ট ওকুমার উদ্যানে ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য চা-পানের আয়োজনমূলক সভার অনুষ্ঠান হয়। এতদুপলক্ষে ইণ্ডো-জাপানিজ এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে মহারাজকে একখানি মানপত্র দেওয়া হয়। মানপত্রখানি এসো-সিয়েসনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ব্যারণকাণ্ডা পাঠ করেন। মানপত্রখানি ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছিল ; উহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

"ময়ূরভঞ্জাধিপ শ্রীল শ্রীযুত মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেব

মান্যবরেষু

আমরা—ইণ্ডো-জাপানিজ এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যবর্গ এই উদীয়মান সূর্য্যের দেশে আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগলাভ করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করিতেছি। আপনি আপনার প্রজাগণের কল্যাণসাধনের জন্য অকপট চেষ্টা করিয়া থাকেন—ইহা আমরা উপলব্ধি করিতেছি এবং আপনার সহানুভূতিপূর্ণ সুশাসনের জন্য আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। উড়িষ্যা গড়জাত মহালের একজন নৃপতি এই প্রথম আমাদের এখানে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করিলেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি, এই পরিদর্শনের ফলে আমাদের ও আপনার প্রজাবৃন্দের পরস্পরের কল্যাণ হইবে। সামন্ত-রাজবর্গ যদি প্রতি বর্ষে এইভাবে এদেশে আগমন করেন, তাহা হইলে ভারত ও জাপান প্রকৃত সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইবে।

আপনার জাপান-ভ্রমণ সুখময় ও সাফল্যমণ্ডিত হউক এবং স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আপনি দীর্ঘজীবন সানন্দে ভোগ করিতে থাকুন।

(স্বাক্ষর) শিজেনোবু ওকুমা

প্রেসিডেণ্ট

এবং সদস্যবর্গ—

ইণ্ডো-জাপানিজ এসোসিয়েসন।

টোকিও, ২৪শে জুন, ১৯১০।”

তৎপরে এই মানপত্রখানি একটী রৌপ্যাধারে করিয়া মহারাজাকে উপহার দেওয়া হয়। এই মানপত্রের উত্তরে মহারাজা বলেন,—“জাপানের নিকট ভারতের অনেক বিষয় শিখিবার আছে। আমি উড়িষ্যার প্রত্যেক রাজাকে জাপান পরিদর্শন করিতে বলি। আমি এই সুন্দর দেশ পরিদর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি এবং এখানকার

সানুগ্রহ আতিথেয়তায় মনে হইতেছে আমি নিজের বাড়ীতেই আছি।” অতঃপর মহারাজা ইণ্ডো-জাপানিজ এসোসিয়েসনকে মানপত্র দানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন।

২৫শে জুন তারিখে ইণ্ডো-জাপানিজ এসোসিয়েসন মহারাজের সম্মানার্থ উয়োনো পার্কে—টোকিওয়া কাদানে এক ভোজের অনুষ্ঠান করেন। ভোজ-শেষে এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট কাউণ্ট ওকুমা মহারাজের উদ্দেশে তিনবার জাপানের জাতীয় আরাব—'বানজাই' ধ্বনি করিতে বলেন এবং সকলেই তাঁহার আদেশ পালন করেন। মহারাজা এই প্রীতিভোজনের জন্য এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন—আমি জাপান ও জাপানের অধিবাসীগণের এতই গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, বৌদ্ধমতে পুনর্জন্মে বিশ্বাস অনুসারে আমি পরজন্মে জাপানে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। এই এসোসিয়েসনের অন্যতম উদ্দেশ্য– ভারত ও জাপানের মধ্যে বন্ধুতা-স্থাপন। জাপানে যে সকল ভারতীয় ব্যবসায়ী আছেন তাঁহাদিগকে আমি উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী বর্দ্ধনের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

২৬শে জুন রবিবারে ব্যারণ শিবুসাওয়া তদীয় আস্থকায়ামা আসে মহারাজকে জলযোগের ও জাপানী গীত-বাদ্য শ্রবণের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহারাজা জাপানী গীতবাদ্য শ্রবণ করিয়া বলেন,—ভারতীয় গীতবাদ্যের সহিত জাপানী গীতবাদ্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। অতঃপর ব্যারণ শিবুসাওয়া মহারাজকে তাঁহার উদ্যান প্রদর্শন করেন। মহারাজা তাঁহার সুসজ্জিত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও কারুকার্য্য সমন্বিত উদ্যান দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন।

২৭শে জুন সোমবার প্রাতে জাপান-সম্রাট মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রকে সাক্ষাৎকার প্রদান ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন। ঐ দিন

বৈকালে ডাক্তার আইচকে সঙ্গে লইয়া তিনি কিয়োটো যাত্রা করেন। তৎপরে কিযোটা, নারা, ওসাকা, নাগোয়া পরিদর্শন করিয়া ইয়োকোহামা যাত্রা করেন এবং ৪ঠা জুলাই তথায় উপস্থিত হন।

আমেরিকা ও ইংলণ্ড-যাত্রা

এইখানে মহারাজের জাপান-ভ্রমণ শেষ হয়। জাপান পরিদর্শন করিযা মহারাজ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও আনন্দ লাভ করেন। অতঃপর তিনি 'মরেটেনিয়া' নামক জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করেন। ডাক্তার আইচ এইখান হইতে মহারাজার নিকটে বিদায় গ্রহণ করেন ও বারিপদা-অভিমুখে রওনা হয়েন। মহারাজা স্বহস্ত-লিখিত পত্রে জাপান হইতে আমেরিকা-যাত্রার বিবরণ এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন :— "জাপান হইতে আমেরিকা যাইবার পথে কোনও প্রকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। প্রশান্ত মহাসাগর পার হইবার সময়ে উহা খুব ঠাণ্ডা ছিল; তরঙ্গভঙ্গ ছিল না বলিলেই হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে অত্যন্ত শীত পড়িয়াছিল; কারণ আমরা উত্তর দিকে যাইতেছিলাম। ভাঙ্কুবারে পোর্ট মেডিক্যাল অফিসার অর্থাৎ বন্দরের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাক্তার মন্‌রো আমাকে সাদরে গ্রহণ করেন। আমি লাগান ও বানফে এবং উইনিপেগে অবতরণ করিযাছিলাম। তথা হইতে সুবৃহৎ হ্রদ-সমুহের উপর দিয়া টোরোণ্টো যাত্রা করি। অতঃপর নায়েগ্রা জলপ্রপাত পার হইয়া নদীপথে সেণ্ট লরেন্স হইতে মনট্রিল ও কুইবেকে গমন করি। আমি আমেরিকার উপর দিয়া অত্যন্ত দ্রুতই গমন করিয়াছিলাম এবং তথাকার দীর্ঘ ষ্টীমার ও রেল-যাত্রা কতকটা ক্লান্তিকরই হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তথাকার অধিবাসীদের নিকট সদয় ও শিষ্ট ব্যবহার পাইয়াছিলাম। নিউ ইয়র্কে আমি প্রায় ৯দিন ছিলাম। চারি দিন আমি মিষ্টার ও মিসেস পেরিনের অতিথি হইয়াছিলাম। ইঁহারা আমাকে

নিউ ইয়র্কের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। আমি এই সময়ে বেথলেহেমের লোহার কারখানা ও সেনেকট্যাডির বৈদ্যুতিক কারখানা দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। নিউ ইয়র্ক হইতে আমি "লুসিটেনিয়া" নামক জাহাজে আটলান্টিক পার হইযা ইংলণ্ডে পৌঁছি। আটলান্টিক মহাসাগর প্রশান্ত মহাসমুদ্র অপেক্ষাও শান্ত ছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট আমি লণ্ডন সহরে উপনীত হই।"

যে সময়ে মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র জাপান যাত্রা করেন সেই সময়ে মহারাণী ও তদীয় ভগিনী—কুচবিহারের মহারাণীর সহিত ইংলণ্ড যাত্রা করিযাছিলেন। লণ্ডন সহরে মহারাজা মহারাণীর সহিত সম্মিলিত হযেন।

মহারাজা তাঁহার পত্রে আরও লিখিয়াছেন—"ইংলণ্ডের জলবায়ু খুব ভাল; সেপ্টেম্বর মাসে দার্জ্জিলিঙ্গের জলবায়ুর মত। খুব বৃষ্টি হয় এবং আকাশ প্রায় সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন থাকে।

"আমি লণ্ডন হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে একটী কোলাহলশূন্য স্থানে বিশ্রাম করিতেছি। ২৪শে তারিখে আমি ইণ্ডিয়া আফিসে গিযা পোলিটিক্যাল সেক্রেটারী মিষ্টার হার্টজেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আমি পুনরায় কল্য তথায় যাইব ও তথাকার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিত দেখাশুনা করিব। লণ্ডন হইতে চলিযা আসিবার পূর্ব্বে আমি লর্ড মর্লি এবং ভারত-সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সাক্ষাৎকার-লাভের আশা করিতেছি।

"আমরা সকলেই বেশ ভাল আছি। ভৃত্যগণ বাড়ীতে যেমন থাকে তেমনই স্বচ্ছন্দে আছে। চাউল, ডাইল, মসলা এবং ভারতের ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রব্য এখানে সবই পাওয়া যায়। এমন কি, খোঁজ করিলে

গঙ্গাজল পর্য্যন্ত মিলে। মিষ্টার কে-জি গুপ্ত ও বরোদার মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।”

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে নরবিটন হল, লণ্ডন রোড, কিংষ্টন হইতে মহারাজা ডাক্তার আইচের নিকট আর একখানি পত্র লিখেন। উহার মর্ম্ম এই :—

“আমি লণ্ডনের একটি নার্সিং হোম হইতে সগু প্রত্যাবৃত্ত হইযাছি। তথায় আমার দেহে অস্ত্রোপচার হইয়াছিল। উহা সামান্য হইলেও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইযাছিল। এজন্য প্রায় ১৫ দিন আমাকে শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল।*** আমার আশঙ্কা হইতেছে, ইউরোপের অন্যান্য দেশ দেখিবার সময আমার হইবে না। এই মাসেই আমি সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত দেখা ও পার্লামেণ্ট খুলিলে উহা দর্শন করিব। ৪ঠা ডিসেম্বর আমি ইংলণ্ড হইতে ভারত-যাত্রা করিব এবং ঐ মাসেরই শেষাশেষি বোম্বাই বন্দরে উপনীত হইব।”

শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের নিকট মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র লণ্ডন সহর হইতে গত ৯ই সেপ্টেম্বর এক পত্রে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন :—

“আমি চীন, জাপান ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি বিশ্রামের জন্য এখানে রহিয়াছি। আমার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে এবং আশা করিতেছি যে, নববলে বলীয়ান্ হইযা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইব। ইংলণ্ডের জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ এবং স্ফূর্ত্তিকর। আমি যে সকল স্থান পরিদর্শন করিলাম সে সকল স্থানের জলবায়ু প্রকৃতই স্বাস্থ্যকর এবং এইজন্যই আমার পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছে যে. উৎকৃষ্ট জলবায়ু জাতীয় সম্পদ। অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী দেশের তুলনায় ভারতের জলবায়ু নিকৃষ্ট। জাপান ও আমেরিকার অধিবাসীরা বড় চমৎকার

লোক, উহাদের সহিত মিশিতে ইচ্ছা হয় ; উহাদের ভিতর মনুষ্যত্ব খুবই আছে। অপরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত উহারা বিশেষভাবে সদ্ব্যবহার করে ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করে। আমি সর্ব্বত্রই উহাদের নিকট সানুগ্রহ ব্যবহারই পাইয়াছি। ইহারা অদ্ভুত লোক এবং ইহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।"

মহারাজা যতদিন বিদেশে ছিলেন, ততদিন উড়িষ্যার করদরাজ্য-সমূহের পোলিটিক্যাল এজেণ্ট মিষ্টার এল-ই-বি কবডেন ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের শাসনকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি ষ্টেট কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার উপর মহারাজের কিরূপ বিশ্বাস ছিল তাহা লণ্ডন হইতে ডাক্তার আইচকে লিখিত একপত্রে তিনি নিম্নরূপ ব্যক্ত করিয়াছিলেন :—

"আমি জানিয়া সুখী হইলাম যে, পোলিটিক্যাল এজেণ্ট মহাশয় আমার রাজ্যের পরিচালনকার্য্য বিশেষ মনোযোগের সহিত তত্ত্বাবধান করিতেছেন। আমার বিশ্বাস, তাঁহার পরিদর্শনাধীনে কাজ-কর্ম্ম ভালই চলিবে এবং চক্রান্ত করিবার সুযোগ কেহ পাইবে না।"

পোলিটিক্যাল এজেণ্ট মহাশয়ের উপর রাজ্যের ভার ন্যস্ত থাকাতেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে বিদেশ ভ্রমণ করিতে পারিয়াছিলেন।

'মহারাজা' উপাধি—বংশানুক্রমিক

মহারাজের বিদেশে অবস্থানকালে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে 'মহারাজা' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজ্য পরিচালনায় মহারাজার যোগ্যতা, তাঁহার চরিত্রবল ও সৎকার্য্যে দান-শীলতা দেখিয়া গবর্মেণ্ট উক্ত উপাধি বংশগত করিয়া দিলেন। মহারাজা ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এডওয়ার্ড বেকার মহোদয় কলিকাতা সহরে তাঁহাকে এই উপাধির সনদ প্রদান

করেন। সনদ প্রদানের সময়ে তিনি মহারাজের বিবিধ সৎকার্য্য ও সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ময়ূরভঞ্জে প্রত্যাগমন

এই সনদ লইয়া মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বারিপদায় প্রত্যাগমন করেন। বহুদিনের অনুপস্থিতির পর তাঁহার আগমনে প্রজাগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং উৎফুল্লচিত্তে সোৎসাহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। এতদুপলক্ষে রাজ-পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ, রাজ্যের কর্ম্মচারিগণ এবং প্রজাগণ সম্মিলিত হইয়া মহারাজকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন, তাহাতে মহারাজের প্রত্যাগমনে ও স্বাস্থ্যোন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ এবং তাঁহার বিবিধ গুণরাজির, সুশাসনের এবং তাঁহার শাসনকালে রাজ্যের নানা প্রকার উন্নতির বিষয় উল্লেখ করা হয়। অভিনন্দনপত্রের উপসংহারে মহারাজের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হইয়াছিল।

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর ভারতাগমন—দিল্লী দরবার—কলিকাতা-মিছিল-গঠনে মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের চেষ্টা-যত্ন

মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের স্বদেশে প্রত্যাগমনের কিছুদিন পরেই সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও তদীয় মহিষীর ভারত-আগমনের সমাচার বিঘোষিত হয়। ইহার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং সর্ব্বত্র রাজভক্তির ও আনন্দের উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ইতিপূর্ব্বে আর কখনও সশরীরে ভারতে পদার্পণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের পদার্পণ ভারতে প্রথম হইবে বলিয়া দেশময় তাঁহাদের অভ্যর্থনা

ও সম্বর্দ্ধনার কিরূপ বিপুল ব্যবস্থা হইবে তাহার পরিকল্পনা চলিতে থাকে। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যেও সাড়া পড়িয়া যায়। মহারাজা সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর অভ্যর্থনার উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। অবশ্য রাজকার্য্য যেমন তিনি সাধারণতঃ করেন তেমনই করিতে থাকেন বটে কিন্তু উক্ত ব্যাপারে ব্রতী হইয়া তিনি রাজ্যে নূতন কোনও উন্নতিজনক সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিবার সময় পান নাই।

কলিকাতা সহরে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর শুভাগমন ও সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে যে মিছিল-গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছিল উড়িয়া পাইকদের সামরিক নৃত্য ত হার অঙ্গীভূত থাকিবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। উড়িয়া পাইকদের এই সামরিক নৃত্য-প্রদর্শনের ভার মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের উপর পড়ে। কারণ এ সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে এই শ্রেণীর সামরিক-নৃত্য-কুশল পাইকের বস-বাস বলিয়াই মিছিলের কর্তৃপক্ষ মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রকেই ইহা গঠনের ভার দিয়াছিলেন। এই কার্য্যে মহারাজকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই নৃত্যের উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারী করা, তদনুরূপ অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা, নূতন সংগৃহীত পাইকদিগকে লইয়া নৃত্যের মহল্লা দেওয়া ইত্যাদি কার্য্য অল্প পরিশ্রম-সাপেক্ষ ছিল না। কয়েক মাস ধরিরা মহারাজকে প্রত্যহ দুই-বার করিয়া ইহার মহল্লায় যোগ দিতে হইত। মহারাজা স্বয়ং, তাঁহার ভ্রাতা ও পিতৃব্য-পুত্রগণ কখনও মৌখিক উপদেশ দিয়া, কখনও অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া পাইকগণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সামরিক নৃত্যে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—এমন কি মাংসপেশী পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইত। অবশেষে তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছিল। কলিকাতা শোভাযাত্রার অধ্যক্ষদ্বয়—মহারাজা স্তর প্রদ্যোতকুমার ও মিষ্টার ল্যাসেলেস্ বারিপদায় গমন করিয়া যেদিন উড়িয়া পাইকদের সামরিক নৃত্যের মহল্লা দর্শন করিলেন, সেইদিন তাঁহারা শতমুখে

ইহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। মিষ্টার ল্যাসেলেস বলিলেন,—সমস্ত মিছিলের মধ্যে এই সামরিক নৃত্য সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য হইবে। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী স্বয়ং কলিকাতার গড়ের মাঠে উড়িয়া পাইকগণের এই সামরিক নৃত্য দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্রাট স্বয়ং ৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী বড়লাট বাহাদুরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদে দুঃখ-প্রকাশ-প্রসঙ্গে পাইকগণের নৃত্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। সম্রাট লিখিয়াছিলেন—"সম্রাজ্ঞী এবং আমি আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে ময়ূরভঞ্জের মহারাজার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া শোকার্ত্তা মহারাণীকে আমাদের অকপট সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবেন। কলিকাতা গড়ের মাঠে মিছিল-গঠনে মহারাজা যে সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে তাঁহাকে তথায় দেখিয়া আমরা যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম তাহার স্মৃতি এখনও আমাদের মনে জাগরূক রহিয়াছে।"

দিল্লী-দরবারে

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লী সহরে যে দরবার বসিয়াছিল, মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র মহারাণী ও মহারাজকুমারগণ-সহ সেই দরবারে যোগ দিয়াছিলেন। দরবারে সশরীরে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের নিকট রাজভক্তি ও আনুগত্য জ্ঞাপন করিবার সম্মানলাভ সকল রাজা-মহারাজার ভাগ্যে হয় নাই। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং সম্রাটের নিকট রাজভক্তি ও বশ্যতা-জ্ঞাপনের সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি কলিকাতা-মিছিলের সুব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসেন। সম্রাট-দম্পতী কলিকাতায় আগমন করিলে মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্র সম্রাজ্ঞীর সম্মানিত বালভৃত্য (Page) হইয়াছিলেন।

ময়ূরভঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন ও দুর্ঘটনায় মৃত্যু

এই উৎসবের পর মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ময়ূরভঞ্জে প্রত্যাগমন করেন এবং রাজধানী বারিপদায় উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্যে মনোযোগী হয়েন। দুই বৎসর ধরিয়া তিনি শাসনকার্য্যে যে সকল নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করিতে থাকেন। এইসকল সঙ্কল্পিত ব্যবস্থার মধ্যে ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট রেলপথ-বৃদ্ধিসাধন অন্যতম ছিল। এই রেলপথকে তিনি রাজ্যের মধ্যস্থ অরণ্যের ভিতর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে অভিলাষী হয়েন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে নিমন্ত্রণ করেন। যেসকল স্থানের উপর দিয়া রেলপথ যাইবে সেইগুলি তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দেওয়াও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। ৩০শে জানুয়ারী তারিখে ইঁহারা রাজপরিবারের কতিপয় ব্যক্তির সহিত শিকার করিতে গমন করেন। কিন্তু কোনও জন্তু শিকারের জন্য পায়েন নাই। সেইজন্য পরদিন মহারাজা ইঁহাদের সঙ্গে শিকারে গমন করেন এবং তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, ভাল শিকার নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। বারিপদার নিকটে—কৃষ্ণচন্দ্রপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে একটী জঙ্গলে শিকারের জন্য 'বীট' দেওয়া হয়। একটি ভালুক মারা হয় এবং আর একটি ভালুক বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া পলাইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। 'বীট' তখনও শেষ হয় নাই; কিন্তু 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'! 'বীট' শেষ না হইলে মাচান হইতে নামিতে নাই—ইহাই শিকারের নিয়ম। কিন্তু মহারাজা তাঁহার বিশ্বাসভাজন অনুচর রাধু মহাপাত্রের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও মাচান হইতে নামিয়া পড়েন। রাধু বার বার বলিয়াছিল—মহারাজা মাচান হইতে নামিবেন না; আগে বীটওয়ালারা ফিরিয়া আসুক,

তার পর নামিবেন ! কিন্তু মহারাজা তাহার কথা শুনিলেন না, মাচান হইতে নামিয়া পড়িলেন। বিশ্বাসভাজন অনুচরও তখন মহারাজার সহিত মাচান হইতে নামিয়া পড়িয়া তাঁহার অনুগমন করিল মহারাজার পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ছিল। পরবর্ত্তী মাচানের উপর যে শিকারী ছিলেন, তিনি অস্পষ্ট আলোকে মহারাজকে আহত ভল্লুক মনে করিয়া গুলি ছুঁড়িলেন। গুলি রাধুর হাঁটুতে বিদ্ধ হইল এবং সে 'প্রাণ গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মহারাজা ব্যাপার কি ঘটিয়াছে তাহা জানিবার পূর্ব্বেই আরে একটি গুলি নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে আসিয়া লাগিল এবং গুলির ভিতরকার স্পিলিণ্টার গুলি মহারাজার দুই হাতে ও বুকে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্তকাল তিনি এই আঘাতে নির্ব্বাক হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে যখন রাধুর ক্রন্দনে অন্যান্য শিকারীগণ দ্রুতগতিতে অকুস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কিন্তু মহারাজার হৃদয় এরূপ সমুন্নত ছিল যে, তিনি সকলকে বলিতে লাগিলেন—আপনারা আমার কাছেই সকলে রহিয়াছেন কেন? বেচারী রাধুকে আগে দেখুন। মহারাজা তখন নিজেই যন্ত্রণায় অস্থির ; এমন অবস্থায়ও তিনি অপরের যন্ত্রণা-নিবারণের জন্য ব্যস্ত !

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় সেই সময়ে বারিপদাতে ছিলেন। এই দুর্ঘটনার সংবাদ তথায় পৌঁছিলে কিরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা তিনি নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"আমরা বৈকাল বেলা ডাক্তার আইচের নিকট বসিয়াছিলাম। সেই সময় একটী মোটরগাড়ী দ্রুতবেগে আসিয়া ডাক্তার আইচের গৃহদ্বারে দাঁড়াইল। গাড়ীতে ছিলেন—লালসাহেব গিরিশচন্দ্র ভঞ্জদেব। তিনি যেন পাগলের মত আসিয়া এই দুর্ঘটনার সংবাদ আমাদিগকে জানাইলেন এবং সেই মোটরগাড়ীতেই ডাক্তারকে লইয়া দ্রুতবেগে

ঘটনাস্থলে ছুটিলেন। শীঘ্রই এই দুর্ঘটনার সংবাদ দাবানলের মত চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল এবং শঙ্কা ও উদ্বেগে লোকে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখনই প্রকৃত সংবাদ জানিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোক দলে দলে ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। এমন কি, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাও একে অপরের বাড়ীতে ছুটিল অথবা দেওয়ানের বাটীতে উপস্থিত হইল— সকলেই মহারাজের সংবাদ লইবার জন্য উৎকণ্ঠিত। প্রায় এক ঘণ্টা কাল লোকে এইরূপ উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় কাটাইয়াছিল। তার পর দেওয়ান মহাশয় মোটর গাড়ীতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে, মহারাজা ভাল আছেন এবং একটী গাড়ী করিয়া বেলগাডিয়া প্রাসাদে আসিতেছেন। ইহাতে লোকের আতঙ্ক ও উদ্বেগ তখনকার মত কতকটা দূর হইল বটে, কিন্তু সেই রাত্রি কাহারও শান্তিতে কাটে নাই। সেই দিনই সন্ধ্যার সময়ে বালেশ্বরের সিভিল সার্জ্জনকে স্পেশ্যাল ট্রেণযোগে আনা হইল এবং পরদিন প্রাতঃকালে ময়ূরভঞ্জের অধিবাসীরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল যে, মহারাজার আঘাত একেবারেই গুরুতর নহে। তাঁহার অনুচরকে বারিপদা হাঁসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছিল, কিন্তু পরদিন প্রাতেই তাহার মৃত্যু হয়। মহারাজা ক্রমেই সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ইহার পরে তাঁহার জীবনের কোনও প্রকার আশঙ্কা ঘটিতে পারে এরূপ সন্দেহও তখন কাহারও মনে হয় নাই।”

সুস্থ হইয়া কিছুদিন পরে মহারাজা কলিকাতায় আগমন করিলেন। চিকিৎসা করা তাঁহারা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না; নব-গঠিত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস তাঁহার রাজ্যবর্ত্তী মেঘাশনি পাহাড়ে করিবার ও তথায় উড়িষ্যার জন্য স্বাস্থ্যাবাস স্থাপন করিবার প্রস্তাব-সম্পর্কে জনৈক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকে আমন্ত্রিত করিয়া ময়ূরভঞ্জে লইয়া যাওয়াই তাঁহার প্রধান অভিপ্রায় ছিল। শেষোক্ত উদ্দেশ্যেই তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতা সহরে ‘এক্সরে’ পরীক্ষায়

স্থির হইল যে, গুলির ছিন্নাংশগুলি মহারাজের হাতে ও বুকের ভিতরে বিঁধিয়া রহিয়াছে। ডাক্তারেরা ক্লোরোফরম-সাহায্যে মহারাজের দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া সেইগুলি বাহির করিয়া দিলেন; কিন্তু তাঁহার দেহের শোণিতে বিষ-ক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গেল। চিকিৎসা দ্বারা যতদূর চেষ্টা করা যাইতে পারে তাহা করা হইল, কিন্তু মহারাজা রক্ষা পাইলেন না; ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুযারী প্রাতঃকালে তাঁহার মৃত্যু হইল। অবশ্য গুলির আঘাতের পরবর্ত্তী ক্রিয়ার ফলেই যে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের মৃত্যু শোচনীয় বটে, কিন্তু তিনি বীরের মতই এই মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান অক্ষুণ্ণ ছিল। বিষক্রিয়ার ফলে তাঁহার যে অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল তাহা তিনি বীরোচিত সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিয়াছিলেন, একটীবারও কোনও প্রকার কাতরোক্তি করেন নাই। তিনি অশ্রুপাত করেন নাই, ভাগ্যের প্রতিকূল একটি অভিযোগও করেন নাই। তিনি হাসিমুখে এই জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্ব্বে দেওয়ান তাঁহার নিকটে আগমন করেন। মুমূর্ষু মহারাজ তখনও মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন; সেই সময়ে তাঁহার বাক্‌শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর পরে তাঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা বুঝিতেই পারেন নাই যে, মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে। কারণ যে মিষ্ট হাসি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল, সেই মিষ্ট হাসি তখনও তাঁহার মুখে লাগিয়াছিল।

মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেবের এই শোচনীয় মৃত্যুতে সমগ্র ময়ূরভঞ্জ রাজ্য শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি প্রকৃতই প্রজাগণের পরম হিতৈষী ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার পরলোক-গমনে প্রজাবৃন্দ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিল।

রাজ্যের উন্নতি বিধানে মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র

১৮৯২—৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট কাউন্সিল বা ময়ূরভঞ্জ মন্ত্রণা-পরিষদ গঠন করেন। এই কাউন্সিল বা পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন মহারাজা স্বয়ং; এতদ্ব্যতীত চারিজন সরকারী সদস্য—দেওয়ান, ষ্টেট জজ, ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ার ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং দুইজন বে-সরকারী সদস্য এই মন্ত্রণা পরিষদে থাকিতেন। তখন ছোটরায় বৃন্দাবনচন্দ্র ভঞ্জদেব ও বিবর্ত্ত রামহরিজিৎ বাবু—এই দুইজন বে-সরকারী সদস্য ছিলেন। বে-সরকারী সদস্যগণকে মহারাজাই মনোনীত করিতেন। এই মন্ত্রণা-পরিষৎ রাজ্য-পরিচালনের জন্য আইন প্রণয়ন এবং রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের জন্য কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেন। এতদ্ব্যতীত রাজ্যের এক বৎসরের আনুমানিক আয়-ব্যয় নির্দ্ধারণ (Budget), রাজ্যের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান, রাজস্ব-বিষয়ক ব্যবস্থা-প্রণয়ন প্রভৃতিও এই পরিষৎ হইতেই হইত। এই নব-গঠিত ষ্টেট কাউন্সিলের প্রথম কার্য্য—ময়ূরভঞ্জে ব্রিটিশ ভারতে প্রচলিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের প্রবর্ত্তন। প্রজাস্বত্ব আইন, কোর্ট ফি বিষয়ক আইন, ষ্ট্যাম্প আইন, দলিল রেজিষ্টারী করিবার ব্যবস্থা, হিন্দুর দেবোত্তর ব্যবস্থা, শ্রমিক আইন, দুষ্ট লোকদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আইন, গ্রাম্য পুলিশ-সংগঠন, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য-সংক্রান্ত আইন প্রভৃতির প্রবর্ত্তনও ব্রিটিশ ভারতের আদর্শে হইয়াছিল। ব্রিটিশ ভারতে প্রচলিত আইনের উপর মহারাজার অত্যন্ত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ছিল। তিনি বিচার ও শাসন-বিভাগ স্বতন্ত্র করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মহারাজাকে পূর্ণ শাসনক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পর মহারাজা 'জুডিশিয়াল কমিটী'

গঠন করেন। তিনি স্বয়ং ও দেওয়ান এই কমিটীতে থাকিতেন। ষ্টেট জজের রায়ের বিরুদ্ধে এই কমিটীর নিকট আপীল করিতে পারা যাইত এবং এই কমিটী সকল আদালতের রায় সংশোধন করিতে পারিতেন।

মহারাজার মৃত্যুকালে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের শাসন-বিন্যাস এইরূপ ছিল ঃ—এই রাজ্য চারিটী মহকুমায় বিভক্ত ছিল—(১) সদর (২) বামনঘাট্টী (৩) পাঁচপীর ও (৪) কাপ্তিপদ। প্রত্যেক মহকুমার ভার একজন কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত, ব্রিটিশ ভারতে সব ডিবিসন্যাল অফিসারের প্রায় তুল্য ক্ষমতা তাঁহার উপর অর্পিত ছিল। ইঁহাকে কতকটা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের কার্য্য করিতে হইত। সদর মহকুমার ভার ছিল ষ্টেট কলেক্টরের উপর; ইঁহার দেওয়ানী মামলার বিচার-ক্ষমতা ছিল না। প্রধান শাসনকর্ত্তার ক্ষমতা, পুলিশ, পূর্ত্তবিভাগ, অরণ্যবিভাগ, শিক্ষা ও চিকিৎসা-বিভাগ মহারাজা প্রত্যক্ষভাবে স্বীয় অধীন রাখিয়াছিলেন। তবে রাজস্ব-বিভাগের পরিচালন-ক্ষমতা তিনি পূর্ণভাবে দেওয়ানের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। জরিপ, কৃষি ও জমিদারীও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দেওয়ানের উপর কলেক্টরের পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। ষ্টেট কলেক্টর, ডেপুটী কলেক্টরগণ এবং ডেপুটী কলেক্টর-রূপে সাব ডিবিসন্যাল অফিসারগণ দেওয়ানের অধীন ছিলেন। ষ্টেট জজ বিচার-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। সব-জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফরূপে সব ডিবিসন্যাল অফিসারগণ তাঁহার অধীন ছিলেন। দেওয়ানী মামলার বিচার-ব্যাপারে ব্রিটিশ ভারতের ডিষ্ট্রীক জজের তুল্য ক্ষমতা ষ্টেট জজের ছিল। তার পর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে তাঁহার উপর দায়রা-জজের ক্ষমতা অর্পিত হয়। তাঁহার রায়ের বিরুদ্ধে জুডিসিয়াল কমিটীতে আপীল করিতে পারা যাইত।

ফৌজদারী ব্যবস্থা উন্নত করিবার জন্য পুলিশ-বিভাগের সংস্কার করা হয় এবং এই বিভাগের কর্ত্তা হয়েন মিষ্টার কিডেল। পূর্ব্বে চৌকীদার ছিল, কিন্তু রাজকোষ হইতে উহারা বেতন পাইত না। লোক যখন খুসী উহাদিগকে চাঁদা করিয়া বেতন দিত। উহারা নিয়মিত কাজও করিত না। কিন্তু মহারাজা চৌকীদারী টেক্সের প্রবর্ত্তন করিয়া উহাদিগের যথাসময়ে বেতন দিবার ব্যবস্থা করেন এবং উহারাও দায়িত্ব লইয়া কার্য্য করিতে থাকে। ১৯১০—১১ সালে রাজ্যে ১৩টী থানা ও ১০টী ফাঁড়ি ছিল এবং পুলিসের সংখ্যা ছিল (চৌকীদার বাদে) ৬৫ অফিসার ও ২৭২ প্রহরী ইত্যাদি।

১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে পেন্সন বা কার্য্যান্তে অবসর-গ্রহণের পর রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মহারাজা তাঁহার সমুদয় প্রজাকে জমির স্বত্বাধিকার প্রদান করেন। ইহাতে জমির উপর প্রজার মমতা বৃদ্ধি পায়। কারণ, কেহ ইহা কাড়িয়া লইতে পারিবে না। অর্থাভাবে এই জমি বিক্রয় করিতে পারিবারও ক্ষমতা তাহার হয়। এইজন্য জমিতে উত্তমরূপে চাষ-আবাদ হইতে আরম্ভ হয়। ফলে ইহার দ্বারা রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। জমির খাজনা ১০, ১৫, ২০ বৎসরের জন্য খুব কম করিয়া নির্দ্ধারিত হয়—এই সময়ের মধ্যে উহার বৃদ্ধি হইতে পারিত না। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে পরবর্ত্তী বৃদ্ধির সময়েও খাজনার হার অল্পই বর্দ্ধিত হইত। আবওয়াব ও অন্য প্রকার জুলুম করিয়া প্রজাদের নিকট হইতে টাকা আদায়ের প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মোটের উপর মহারাজার ২০ বৎসর-ব্যাপী শাসনকালে রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ডেপুটী কনজারভেটর অফ ফরেষ্ট মিষ্টার সি সি হ্যাটকে গবর্মেণ্টের অনুমতিক্রমে ময়ূরভঞ্জের অরণ্য-বিভাগের কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইতিপূর্ব্বে ময়ূরভঞ্জে আধুনিক পদ্ধতিতে

সুগঠিত বন-বিভাগের অস্তিত্ব ছিল না। মিষ্টার হ্যাটের নিয়োগের পূর্ব্বে বন হইতে ময়ূরভঞ্জ সরকারের আয় হইত বার্ষিক মাত্র ৩০ হাজার টাকা। শ্রীরামচন্দ্রের শাসনকালের শেষ ভাগে উহা বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকায় উঠিয়াছিল।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজা রাজ্যের খনিজ সম্পদ্ অনুসন্ধানের জন্য মিষ্টার পি-এন বসু, বি-এস-সি, এফ-জি-এসকে নিযুক্ত করেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল—খনিজ সম্পদে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করা। মিষ্টার পি-এন বসু অনুসন্ধান করিয়া লৌহের খনির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন,—অপরিষ্কৃত অবস্থায় যে লৌহ আছে তাহা একরূপ অফুরন্ত এবং তাহা অতি উৎকৃষ্টজাতীয়। এই সংবাদ যখন চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, সেই সময়ে মেসার্স টাটা এণ্ড সন্স যে অঞ্চলে লৌহের খনি আছে তাহা ইজারা লয়েন এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা গুরুমহিষাণী ও সুলাইপেট পাহাড়ে যে লৌহ আছে তাহা তুলিয়া তাহার পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ঐ বৎসরই আমেরিকার খনি-সংক্রান্ত বিশেষবিৎ মিষ্টার পেরিন ও মিষ্টার অয়েল্ড ঐ লৌহ পরীক্ষা করিয়া বলেন,—সমগ্র এসিয়া খণ্ডে এত উৎকৃষ্ট লৌহ আর নাই। অতঃপর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মেসার্স টাটা এণ্ড সন্সই একটী যৌথ কোম্পানীর পত্তন করেন, উহাই এক্ষণে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড নামে বিখ্যাত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই কোম্পানী পূর্ণ উদ্যমে কার্য্যারম্ভ করেন। এক্ষণে সমগ্র ভারতে এই কোম্পানীর লোহার কারখানার মত বড় কারখানা আর নাই। এই কারখানায় যত লোহা লাগে সে সমস্তই ময়ূরভঞ্জের খনি হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের চেষ্টায় ও উদ্যোগেই আজ ইহা সম্ভব হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা রাজ্যের আয়ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রাজ্যে যে সোপ-ষ্টোন (soap-stone) ও পাথরের দ্রব্যাদি

তৈয়ারীর উপযুক্ত প্রস্তরসমূহ (pot stone quarries) আছে, সেগুলি কলিকাতার কোনও বণিক ইজারা লয়েন এবং ইহা হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার তৈজসপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানি করিতে থাকেন। বেঙ্গল গ্রাণাইট কোম্পানীও গ্রাণাইটের খনি ইজারা লইয়া রপ্তানি করিতেছেন। ইহাতে মহারাজা রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

বুড়া বালং নদীর জল-প্রপাত-জাত শক্তি হইতে তড়িৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভবপর হয় কি না সে সম্বন্ধেও মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাঁহার ষ্টেট ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার জে এ মার্টিনের মস্তিকেই প্রথম এই কল্পনার উদয় হয়; কিন্তু এই পরিকল্পনা অদ্যাবধি কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে সরকারী অফিস, কাছারী, থানা, জেলখানা, হাঁসপাতাল, স্কুল প্রভৃতির জন্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ইমারতসমূহ নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্বে রাজবাটীর এক প্রান্তে সরকারী কাজকর্ম্ম হইত; কিন্তু মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র সরকারী কাজকর্ম্ম বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া দেন ও প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য-পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র ইরামত তৈয়ারী করাইয়া দেন। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস-গৃহও নির্ম্মিত হয়। সেই নিয়ম এখনও চলিতেছে। বারিপদার কিং এডওয়ার্ড চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী যে বিরাট সৌধে অবস্থিত, উহার নির্ম্মাণকার্য্য মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে আরব্ধ হয়। ইহা ব্যতীত আরও ছয়টী ডিস্পেন্সারী বাটী রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্ম্মিত হয়। রাজ্যের নানাস্থানে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের পরিদর্শনকার্য্যের সুবিধার জন্য যে ৩০টী বাটী (Inspection Bunglow) নির্ম্মিত হয়, সেগুলিও দেখিতে সুন্দর। উৎকৃষ্ট ইমারত-হিসাবে বারিপদার স্কুল-বাটী এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউট-বাটী উল্লেখযোগ্য।

মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের শাসনকালে সর্ব্বশুদ্ধ ৫০২ মাইল রাস্তা প্রস্তুত

হইয়াছিল; তন্মধ্যে ১৪৯ মাইল পাকা ও ৩৫৩ মাইল কাঁচা। ইহা ব্যতীত অনেক পুরাতন সঙ্কীর্ণ রাস্তা প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়; জীর্ণ পথ সুসংস্কৃত হয়। তাঁহার আমলে পথের অবস্থা এত উন্নত হইয়া উঠে যে, রাজ্যের সর্ব্বত্র মোটর-যোগে যাতায়াত করা সম্ভবপর হয়।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির পক্ষে জলসেচন আবশ্যক। এই জলসেচনের সুবিধার জন্য মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বশুদ্ধ ১৪॥০ মাইল দীর্ঘ খাল খনন করেন; একটী খালের দৈর্ঘ্য ৮॥০ মাইল, ইহার নাম বলদিহা খাল; অপরটীর নাম হলদিয়া খাল—ইহা ৬ মাইল দীর্ঘ। এই দুইটী খাল দ্বারা যথাক্রমে ২, ৩৬৪ ও ২,২৪৩ একর ভূমিতে জল-সেচনের সুবিধা হইয়াছে।

মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন এবং মানুষও চিনিতেন। এইজন্য তাঁহার পার্শ্বে বহু যোগ্য ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। মহারাজার নামের সহিত ময়ূরভঞ্জের উন্নতির ইতিহাসে এই সকল ব্যক্তিরও নাম জড়িত থাকিবে। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের পূর্ত্ত-বিভাগের যাবতীয় উন্নতিকর কার্য্যের মূল ছিলেন মিষ্টার জে-এ মার্টিন। কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ ইহাকে রাজ্যের চীফ ইঞ্জিনীয়ার-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে ইনি মহারাজার অধীনেই কার্য্য করিতে থাকেন এবং ইঁহারই সহযোগিতায় মহারাজা রাজ্যের পূর্ত্ত-সংক্রান্ত বিস্তর উন্নতি সাধন করেন। মিষ্টার কিডেলও রাজ্যের বিবিধপ্রকার কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর, এম-এ, বি-এল—কটকে প্রথম ইঁহার সহিত মহারাজার পরিচয় হয়। তখন মোহিনীবাবু রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি প্রথমে ময়ূরভঞ্জের আইন-সংক্রান্ত পরামর্শদাতা এবং তরুণ মহারাজার গণিত ও বিজ্ঞান-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বারিপদায় আগমন করেন। ক্রমে ইনি রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ, ষ্টেট জজ,

এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন দেওয়ান বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষাল মহাশয়ের মৃত্যু হইলে দেওয়ান নিযুক্ত হন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের শাসন-সংস্কারে মোহিনী বাবু মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। মহারাজার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই ইনি স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। ষ্টেট জজ শ্রীযুত হরিদাস বসু যোগ্যতায়, নিরপেক্ষ বিচারে এবং চরিত্র-মাধুর্য্যে যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা কখনও লুপ্ত হইবে না। বাবু ননীমাধব মুখোপাধ্যায় হিসাব-পরীক্ষক (Auditor) নিযুক্ত হইয়া ময়ূরভঞ্জে আগমন করেন; শেষে একজামিনার অফ একাউণ্টস হয়েন। রাজ্যের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত হিসাবে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনিই রাজ্যের হিসাব-বিভাগের পত্তন করেন (Finance Department)। অকালে ইহার মৃত্যু হওয়ায় রাজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। ইঁহার মৃত্যুর পর ইহার ভ্রাতা ফণিমাধব মুখোপাধ্যায় এই পদে যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম করেন। ইঁহারা ব্যতীত পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র মহাপাত্র (ইনি প্রথমে মহারাজার গৃহশিক্ষক শেষে সহকারী ষ্টেট জজ হইয়াছিলেন), ষ্টেট কলেক্টর বাবু রামনারায়ণ সারাঙ্গী ও ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত রাজ্যের উন্নতি-সাধনে প্রকৃত সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মত সহযোগী না পাইলে মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে এত অল্পদিনে এতদূর উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর হইত না।

উড়িষ্যার করদরাজ্যসমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার কবডেনও ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের উন্নতি-সাধনে মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রকে বহু মূল্যবান উপদেশাদি দিয়াছিলেন।

মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের উন্নতি-দর্শনে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এডওয়ার্ড বেকার ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মহারাজের হস্তে বংশানুক্রমিক মহারাজার উপাধির সনন্দ প্রদান করিবার সময়ে

এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন ঃ—আপনার শাসন-সময়ে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে এবং এইজন্য গবর্মেণ্ট ইহার প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন। আমার বিশ্বাস আছে, আপনার তরুণ বংশধর রাজকার্য্যে আপনার অনুসরণ করিবেন! ইহার একবৎসর পরেই মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র শোচনীয় দুর্ঘটনায় পরলোক গমন করেন।

মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের অকাল মৃত্যু-উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোক-সভায় মহারাজের যোগ্য স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব-আলোচনা-প্রসঙ্গে দেওয়ান বাবু মোহিনীমোহন ধর যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি বলেন—"মহারাজের সহিত আমার ২৪ বৎসরের পরিচয়—পরিচয়ের প্রথম স্তরে কটকে তিনি আমার ছাত্র, শেষ স্তরে ময়ূরভঞ্জে তিনি আমার প্রভু। আমি তাঁহাকে যেরূপ অন্তরঙ্গভাবে জানি, অতি অল্পলোকে তাহা জানেন। আমার অতি প্রিয়তম মহারাজাকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি আদর্শ নৃপতি, অভিজ্ঞ শাসক, উন্নতচরিত্র সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তি এবং আদর্শ ভদ্রলোক। তাঁহার শাসনের মূলনীতিই ছিল—ন্যায়পরতা, সংস্কার ও উন্নতি। ময়ূরভঞ্জের সকলেই জানিত, তিনি কিরূপ চুল চিরিয়া ন্যায়-বিচার করিতেন। যখন মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন রাজ্যের আয় ছিল ৪ লক্ষ টাকার কিছু উপর; কিন্তু এক্ষণে রাজ্যের আয় ১৩ লক্ষ টাকা। ২২ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি রাজ্যের আয় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইচ্ছামত করবৃদ্ধি করিয়া তিনি এই আয়বৃদ্ধি করেন নাই; জমির জরিপ যথাযথভাবে করিয়া খাজনার হার যথাযথভাবে নির্দ্দেশ করিয়াই তিনিই রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার শাসনভারগ্রহণের সময়ে ময়ূরভঞ্জ রাজ্য একরূপ আদিম অবস্থায় ছিল বলিলেই হয়; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে ক্ষুদ্র ময়ূরভঞ্জ রাজ্য দেশীয় সামন্তরাজ্যসমূহের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সুশাসিত সেগুলির মধ্যে অন্যতম হইয়া উঠে। এই রাজ্যের শাসন-কার্য্যের

প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক্ষণে সুনির্দ্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা বিদ্যমান। ব্রিটিশ ভারতে প্রচলিত শাসন-পদ্ধতির অনুরূপ ব্যবস্থা অনুসারেই তিনি তাঁহার রাজ্যের শাসন-আয়তন গঠন করেন এবং তাহাতে রাজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। তিনি মৃত্যুকালে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যকে যেরূপ উন্নত অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন জনসাধারণ ও গভর্মেণ্ট উভয়েই সেজন্য তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট তাঁহাকে আদর্শ শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন। প্রজাগণের মঙ্গল, রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং শাসন-কার্য্যের উন্নতি-সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল; এইজন্য প্রজাবর্গ তাঁহার অতীব অনুরাগী ছিল। তিনি আপনাকে রাজ্যের একজন কর্ম্মচারী বলিয়া মনে করিতেন এবং বলিতেন, ঈশ্বর তাঁহাকে এই রাজ্যের কর্ণধাররূপে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি এই রাজ্যের বিধাতা-নিয়োজিত প্রতিভূ। ভারতের সামন্তরাজগণ কেমন হইবেন সে সম্বন্ধে কোন বড়লাট একবার বলিয়াছিলেন,—"তাঁহাদের রাজ্য তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে; রাজ্যের রাজস্বও তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। বিধাতা এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন যে, রাণী মধুমক্ষিকারা যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মধুচক্রে মধু সঞ্চয় করে, তাঁহারাও তেমনই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য পরিশ্রম করিবেন, পুংমধুমক্ষিকাগুলি যেরূপ অলস ও নিষ্ক্রিয়ভাবে জীবন যাপন করে তাঁহারা যেন সেরূপ না করেন। সামন্তরাজগণই প্রজাগণের উপকারের জন্য জীবন ধারণ করেন, প্রজাগণ সামন্তরাজগণের জন্য জীবন ধারণ করে না। বিধাতার ইহাই ইচ্ছা যে, তাঁহারা লোকের আদর্শ-স্বরূপ হইবেন, তাঁহাদের নায়ক ও পরিচালক হইবেন।" মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র যে এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি কখনও সময়ের অপব্যয় করিতেন না এবং রাজ্যের কল্যাণের জন্য কখনও পরিশ্রম-কাতর হয়েন নাই। কর্ত্তব্য-সাধনে

কখনও তিনি যত্ন-চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। যে শোচনীয় আঘাতের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়, সে আঘাতে যখন তাঁহার দুইটী আহত হস্তেই ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং দুইটী হস্তেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা তখন তিনি কতকগুলি আপীল শুনিবার জন্য জুডিসিয়াল কমিটীর বৈঠক বসাইতে বলেন। সে সময়ে তাঁহার নড়িতে চড়িতেও তীব্র যাতনা হইত। অনেক কষ্টে আমি তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে পারিয়াছিলাম।

"শাসন-কার্য্যে তিনি যে মূলনীতি অনুসারে চলিতেন তাহা এই—যোগ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের হস্তে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা এবং বৈধ শাসন ও ব্যক্তিগত শাসন—এই উভয়ের মধ্যে যাহা যাহা উৎকৃষ্ট তাহা তাহা গ্রহণ করা। তিনি কখনও নিজেকে আইনের গণ্ডীর বহির্ভূত মনে করিতেন না এবং ব্রিটীশ ভারতে প্রচলিত ব্যবস্থা-অনুসারে তিনি তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে আপীল করিবার অধিকার দিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল—কোনও লোকই অভ্রান্ত নহে অর্থাৎ ভুল-চুক সকল মানুষেরই হইয়া থাকে। সেইজন্য আপীল আদালতে তাঁহাদের আদেশ অবৈধ হইয়াছে বলিলে তিনি তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিতেন এবং সেজন্য একটুও দুঃখিত হইতেন না। সময়ে সময়ে জুডিসিয়াল কমিটিতে আপীলের ফলে তিনি আপনার আদেশের অবৈধতা বুঝিয়া উদারভাবে আপনার ভ্রম স্বীকার করিতেন। এরূপ উদাহরণ অবশ্য অল্প। কিন্তু অল্প হইলেও ভারতের কয়জন সামন্তরাজ কল্পনায়ও ইহা সহ্য করিতে পারেন যে, তাঁহাদেরই কর্ম্মচারীরা তাঁহাদেরই আদেশ উল্টাইয়া দিতেছে? কিন্তু মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র তাহা পারিতেন। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার হৃদয় ও মনের উদারতা ও বিশালতা কত দূর ছিল।"

"মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের সিংহাসনাধিরোহণের পর হইতেই

ময়ূরভঞ্জরাজ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়াছে, শাসন-কার্য্যের উন্নতি হইয়াছে, রাজ্যের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, লোকের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইয়াছে ; রেল লাইন খোলা হইয়াছে ; দীর্ঘ খাল খনন করা হইয়াছে ; অন্যান্য জনহিতকর কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার জন্যই আজ সমগ্র ভারতের গৌরব-স্বরূপ টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ওয়ার্কস সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি যদি দীর্ঘায়ু হইয়া তাঁহার বিদ্যুৎ-শক্তি-উৎপাদনের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে উহাও তাঁহার যশোমুকুটের অন্যতম রত্নরূপে বিরাজ করিত। তিনি যদি অকালে কাল-কবলিত না হইতেন, তাহা হইলে আরও অনেক কাজই তিনি করিয়া যাইতেন। জীবনের শেষ ভাগে তারবন্দ পর্য্যন্ত রেলওয়ের বিস্তৃতি-সাধন এবং মেঘাশনি পাহাড়ে বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের ছোটলাটের গ্রীষ্মাবাস-নির্ম্মাণ—এই দুইটী কার্য্যই তাঁহার মনোযোগ অধিক মাত্রায় আকর্ষণ করিয়াছিল।”

“মহারাজা নিজের চেয়েও তাঁহার প্রজাদিগকে ভালবাসিতেন এবং যোগ্যতা, চরিত্র ও গুণ থাকিলে সেই ব্যক্তির সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতেন। জন্মভূমির কল্যাণের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করাই তাঁহার আদর্শ ব্রত ছিল এবং এই প্রিয়কার্য্যসাধনে তিনি যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা বড় সামান্য নহে। তাঁহার সমুন্নত চরিত্র, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বিপুল অভিজ্ঞতা, রাজ্য-শাসনে অসামান্য যোগ্যতা এবং ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যের জন্য উড়িষ্যার করদরাজ্যসমূহের অধ্যক্ষগণ এবং গবর্মেণ্ট তাঁহার প্রশংসা করেন এবং এইসকল গুণের জন্য তাঁহাকে বংশানুক্রমে মহারাজা উপাধি দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করা হয় ও বিগত দিল্লী দরবারে উড়িষ্যার করদ রাজন্যবর্গের পুরোভাগে

তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। যদি তিনি আরও অধিক কাল বাচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে অধিকতর সম্মানের অধিকারী যে তিনি হইতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।”

“তাঁহার মৃত্যু ময়ূরভঞ্জবাসীর বিপুল ক্ষতির কারণ হইয়াছে। তাঁহার পরলোকগমনে ময়ূরভঞ্জ অভূতপূর্ব্ব যোগ্য নরপতি হারাইয়াছে, উড়িষ্যা একটী উজ্জ্বলতম রত্ন হারাইয়াছে এবং ভারতবর্ষ একটী যোগ্য সন্তান হারাইয়াছে।”

সংবাদ-পত্রের মন্তব্য

“তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘বেঙ্গলী’ পত্র লিখিয়াছিল:—“মহারাজা দীর্ঘকায় সুপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার আকৃতিও সম্ভ্রম-ব্যঞ্জক ছিল। জন্ম ও সংস্কার তাঁহাকে প্রকৃত লোকশাসক করিয়া তুলিয়াছিল।”

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের “দি ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ” পত্রে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত হইয়াছিল:—“ময়ূরভঞ্জের মহারাজা নূতন ধরণের ভারতীয় নৃপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার নিজ রাজ্যের কল্যাণ-সাধনের জন্য সতত চেষ্টিত থাকিতেন। রাভেন্সা কলেজে তিনি একজন সাধারণ লোকের ন্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; কখনও তিনি এমন হাব-ভাব বা জাঁক-জমক দেখান নাই যাহাতে লোকে তাঁহাকে মহারাজা মনে করিতে পারে। তিনি বিশিষ্টরূপ বিনয়ী ছিলেন এবং তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল ময়ূরভঞ্জের উন্নতি-সাধন।”

ঐ তারিখের “ইণ্ডিয়ান মিরর” পত্রে এইরূপ মন্তব্য প্রকটিত হইয়াছিল—“তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক এবং চিত্ত ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। তাঁহার অকপট ও বিনয়াবনত স্বভাব এবং মধুর প্রকৃতি উভয়ই বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক ছিল। তাঁহার শিষ্টাচার ও আতিথেয়তা এবং প্রত্যেক লোকহিতকর ও

সাধুকার্য্যের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি—এই তিনগুণে তিনি সকল সম্প্রদায়ের লোকের প্রীতিভাজন ছিলেন।"

মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের অসামান্য সংযম ছিল। তিনি ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন। দেওয়ান বলিতেন—"আমি তাঁহাকে ২৮ বৎসর জানি, কিন্তু কখনও তাঁহাকে রাগিতে দেখি নাই।" একবার মহারাজার সেক্রেটারী বাবু ননীমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখেন যে, মহারাজা নিজেই তাঁহার ব্যাগটি হাতে করিয়া লইয়া যাইতেছেন। কয়েক হাত পিছনেই মহারাজার ভৃত্য রাধু চলিয়াছে। ইহাতে ননীমাধববাবু রাধুকে কর্ত্তব্যচ্যুতির জন্য তিরস্কার করেন এবং বলেন, কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে মহারাজা রাগ করিবেন। রাধু তাহা শুনিয়া বলে—"মহারাজা কখনও আমাদিগকে বকেন না বা আমাদের উপর রাগ করেন না। রাত্রিতে যদি আমি ঘুমাইয়া পড়ি এবং যদি তাঁহার আমাকে তখন দরকার হয়, তাহা হইলে তিনি খুব আস্তে আমার গা ছুঁইয়া আমাকে ডাকেন, অথবা আমাকে একেবারেই ডাকেন না।"

মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র মোটেই বিলাসী ছিলেন না। তাঁহার আত্মত্যাগও ছিল অসাধারণ। দেওয়ান মহোদয় মহারাজের স্মৃতি-সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন—"বারিপদায় মহারাজা একটী অতি ক্ষুদ্র ও অল্প-বায়ুচলাচল-বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে দিনরাত্রি যাপন করিতেন। ইহাই তাঁহার শয়ন-গৃহ ছিল। ঘরটি আবার কাগজ দিয়া ভাগ করা ছিল। মহারাজা কয়েক বৎসর ধরিয়াই মনে করিতেন এবং বলিতেন—আর চলে না, আমার নিজের জন্য একটী বাড়ী তৈয়ারী করিব। কিন্তু প্রতি বৎসর বাজেট তৈয়ারীর সময়ে তিনি বলিতেন—থাক এ বৎসর, পরে দেখা যাইবে। আত্মসুখের জন্য সরকারী কাজ বন্ধ করা যাইতে পারে না। মহারাজা খুবই ধনী ছিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি সহজ,সরল ও অনাড়ম্বর-ভাবেই চলিতেন। একরূপ সন্ন্যাসীর মতই তিনি থাকিতেন। সাদা-

সিধাভাবে থাকা ও উচ্চ চিন্তা করা—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ।"

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের "ষ্টেটসম্যান" পত্র মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছিল—"তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন, ব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁহার প্রভূত যোগ্যতা ছিল এবং তাঁহার আদর্শও ছিল উন্নত।"

মহারাজকে রাজর্ষি বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বিপুল আয় তিনি সদনুষ্ঠানে ও জনগণের কল্যাণার্থ ব্যয় করিতেন। তিনি স্বয়ং সন্ন্যাসীর মত থাকিতেন। মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র নিরামিষাশী ছিলেন এবং কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিতেন না।

উড়িষ্যার করদরাজ্যসমূহের নৃপতি-মণ্ডলে সুশাসনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যকে সর্ব্বপ্রকারে সমুন্নত করিয়া তিনি তাঁহার সেই আদর্শ সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তি ময়ূরভঞ্জের তথা উড়িষ্যার ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

স্বর্গীয় মহারাজা পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেব

মহারাজা পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেব ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজমীর রাজ-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন। গুজরাটের ওয়ানকানির রাজ্যের মহারাণা রাজা সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পিতার ন্যায় মহারাজা পূর্ণচন্দ্রও প্রজাগণের হিতকাঙ্ক্ষী এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি লোকহিতকর বহুকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্বর্গীয় মহারাজা পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেও

মহারাজা প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জদেব

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এস-সি পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেন। তৎপরে আজমীর রাজ-কলেজে ভর্ত্তি হন। সাপুরার মহারাজাধিরাজের পৌত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সাপুরার মহারাজাধিরাজ-বংশ রাজপুতনার উদয়পুর-রাজবংশের একটী শাখা। ইহার অগ্রজ মহারাজা পূর্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর ইনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল ময়ূরভঞ্জের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর ইহার প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই ময়ূরভঞ্জের টিকাইত বা বর্ত্তমান যুবরাজ ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। মহারাজা প্রতাপচন্দ্র সুশিক্ষিত, সাহিত্যানুরাগী, শিষ্টাচারপরায়ণ এবং প্রজাগণের হিতকর সকল প্রকার অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা ব্রতী।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা স্যর রামবর্ম্মা কুলশেখর কিরীটপতি মন্নি স্থলতান মহারাজা রাজা রামরাজা বাহাদুর সমসের জঙ্গ জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই, এম্-আর-এ-এস্

ত্রিবাঙ্কুর ভারতের মধ্যে স্বর্ণরাজ্য বলিয়া বিখ্যাত। এই রাজ্যের পূর্ব্বদিকে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা, পশ্চিমে বীচিমালা-বিক্ষোভিত সমুদ্র এবং উত্তরে কোচিন রাজ্য। রেলওয়ের দ্বারা ত্রিবাঙ্কুর আজ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইলেও ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসীদিগের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ত্রিবাঙ্কুরের সমাজ-বিন্যাস, আচার-পদ্ধতি, বদান্যতা আপন রাজ্যের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশের বণিকদিগের দৃষ্টি ত্রিবাঙ্কুরের প্রতি বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই পতিত হইয়াছে। এই রাজ্যে ধনধান্য প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া অধিবাসিগণ অকাতরে দান করিতে পারে। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড এম্পথিল ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "A rare and valuable combination of conservative instincts with enlightened and progressive views" অর্থাৎ মহারাজ একদিকে যেমন ধর্ম্মমতে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলেন, তেমনি অপরদিকে তিনি উদার-মতাবলম্বী।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা অতি প্রাচীন রাজবংশের বংশধর। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ত্রিবাঙ্কুর অপেক্ষা আরও বিস্তৃততর রাজ্য শাসন করিতেন।

মহারাজের বংশপরিচয়-প্রসঙ্গে মিঃ এস্ রামনাথ আয়ার, এম্-আর-এ-এস্ বলেন, "কোলাঠ নামক রাজবংশ হইতে এই বংশের উৎপত্তি, এই বংশের সাতটী শাখা—মাভেলিকারা, এমরাকাট, কার্ত্তেগাপেলী, মেরিয়াপল্লী, তিরুভেল্লা, প্রাইকারা ও আরানমুলা নামক স্থানে বিস্তৃত। এই বংশের কোন রাজা মারা গেলে যদি কোন সহোদর ভ্রাতা থাকে, তবে তিনি সিংহাসনের অধিকারী হন এবং আর যদি ভ্রাতা না থাকে, তবে ভগ্নীর পুত্র থাকিলে তিনি রাজা হন। বর্ত্তমান মহারাজা "চেরা" শাখা সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন। ৫৮৬ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়।"

হিজ হাইনেস্ স্তর রামবর্ম্মা কুলশেখর কিরীটপতি মন্নী সুলতান মহারাজা রাজা মহারাজ বাহাদুর সমসের জঙ্গ জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই, এম-আর-এ-এস্ ভূতপূর্ব্ব ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মসনদে আরোহণ করেন, ১৯১০ সালে তাঁহার "রৌপ্য জুবিলী" সম্পন্ন হয়। মহারাজ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইঁহাদের বংশগত প্রথা এই যে, সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহাকে তুলাপুরুষ দান ও হিরণ্যগর্ভ যজ্ঞ করিতে হয়। মহারাজও তাহা করিয়াছিলেন।

মহারাজের আকৃতি-প্রকৃতি ছিল অতি সুন্দর। তিনি এক সময়ও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন না; সব সময়ই কাজকর্ম্ম লইয়া থাকিতেন। তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে দরকার-কক্ষে গমনপূর্ব্বক দর্শকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং প্রজাগণের আবেদন-নিবেদন শুনিতেন। তিনি অতি সামান্য প্রজার সহিতও সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি এই সময়ে অতি সাধারণ পোষাক পরিয়া দরবার-কক্ষে যাইতেন এবং দর্শকেরা দাঁড়াইয়া থাকিলে তিনি নিজে কিছুতে বসিতে চাহিতেন না। দর্শকগণের সহিত কাজ-কর্ম্মাদি

হইয়া গেলে তিনি স্নান ও মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়া অফিসে আসিয়া বসিতেন এবং রাজকর্ম্মচারীদের সহিত রাজকার্য্যাদি সমাধা করিতেন। মহারাজ কোনরূপ মাদকদ্রব্য স্পর্শ করিতেন না; এমন কি দরবার-ভোজেও তিনি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। গীতবাদ্যে মহারাজের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। দরবার-ভোজ ছাড়া অন্য কোন সভা-সমিতিতে তিনি বক্তৃতা করিতেন না। মহারাজ সাধারণতঃ নির্জ্জনে থাকিতেই ভালবাসিতেন। টেনিস খেলিতে মহারাজ বড়ই ভালবাসিতেন। কোন লোকের প্রতি যদি মহারাজ বিরক্ত হইতেন, তবে তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না, ইহাতেই সেই লোকটী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া চলিয়া যাইত। তিনি কোন লোকের কোন ক্ষতি করিতেন না। সেই কারণে প্রজাবর্গের মধ্যে তাঁহার কেহ শত্রু ছিল না। প্রতিদিন বেলা ৪টার সময়ে মহারাজা ভ্রমণের জন্য বহির্গত হইতেন এবং প্রতিদিনই একই রাস্তা দিয়া তাঁহার গাড়ী চলিত। মধ্যে মধ্যে দরকার হইলে তিনি পথিমধ্যে তাঁহার নিজস্ব বিভিন্ন প্রাসাদে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম করিতেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি গাড়ী হাঁকাইতেন। পথে যাইতে যাইতে হাত তুলিয়া প্রজারা তাঁহাকে নমস্কার করিলে তিনি প্রতি-নমস্কার করিতেন। সন্ধ্যা ৬টার সময় ফিরিয়া আসিয়া স্নানান্তে মহারাজ মন্দিরে যাইতেন এবং রাত্রি ৮৷৯ ঘটিকার সময় নিদ্রা যাইতেন। কোন কোন সময় বিশ্রামের দরকার হইলে মহারাজ নিজের রাজধানীর মধ্যে যে দুর্গ আছে সেই দুর্গে গিয়া বাস করিতেন। নিজের রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি-সাধনের জন্য মহারাজ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। প্রাদেশিক গবর্ণরদের সহিত মহারাজের পত্র-ব্যবহারাদি চলিত। মহারাজ সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ হিন্দু নরপতি ছিলেন, কেবল একটি বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণ করিতেন; সেটি হইল ইউরোপীয় শাসন-পদ্ধতির অনুসরণ। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজের মৃত্যু হয়।

বালেশ্বরের রাজবংশ

বালেশ্বরের বিখ্যাত রাজবংশের আদিপুরুষগণ বঙ্গদেশ হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যায় যান। এই বংশ তাম্বুলী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং "অষ্টগ্রামী" ইঁহাদের বংশগত উপাধি। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হুগলী জেলার জাহানাবাদ মহকুমার মায়াপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুরের নবম পূর্ব্বপুরুষ মধুসূদন দে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে মায়াপুরে বহু বর্ষকাল বাস করিয়াছিলেন। মধুসূদন মুসলমান ফৌজদারের অত্যাচারে মায়াপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। একটী সুন্দরী তাম্বুলী যুবতীকে কাড়িয়া লইতে ফৌজদার বদ্ধপরিকর হয়। ফৌজদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গ্রামের কেহই সাহস করে না। অবশেষে সকলেই শ্যামাচরণের শরণাপন্ন হয়। শ্যামাচরণ ফৌজদারকে আপন বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহাকে খুন করিয়া তাম্বুলী জাতির মান-মর্য্যাদা রক্ষা করেন এবং গ্রামের যাবতীয় তাম্বুলীকে সঙ্গে লইয়া মায়াপুর পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদের মধ্যে এক একজন এক একদিকে গমন করিয়া বাস করিতে থাকেন, তন্মধ্যে মধুসূদন ঘাটাল মহকুমার বর্দ্ধাতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

এখানে আসিয়া ইংরেজ কুঠীওয়ালাদের রক্ষণাধীনে বেশ শান্তিতে বাস করেন এবং অবশিষ্ট জীবন বিশালক্ষ্মী দেবীর আরাধনায় অতিবাহিত করেন। ঈশ্বর দে নামক একটী পুত্র রাখিয়া তিনি খুব বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। ঈশ্বর দে হইতে হৃদয়রাম দে পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে এই পাঁচপুরুষ ইংরেজ কুঠীওয়ালাদের রক্ষণাধীনে এখানে যে

বেশ শান্তিতে বাস করিতেছিলেন ; তাহা জানা যায়। হৃদয়রাম দের পুত্র জয়কৃষ্ণরাম দে বর্দ্ধা পরিত্যাগ করিয়া কোন সুবিধাজনক স্থান অন্বেষণ করিতে থাকেন। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বালেশ্বর ব্যবসায়ের পক্ষে সুবিধাজনক স্থান দেখিয়া সেইখানে বাস করিতে থাকেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এখানে তিন পুত্র লইয়া আসেন। জয়কৃষ্ণরাম ব্যবসায় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং কিছু ভূসম্পত্তিও করেন। তিনি অল্পকালের মধ্যেই তিন পুত্র রাখিয়া মারা যান ; তন্মধ্যে মাণিকরাম দে খুব বুদ্ধিমান ও মেধাবী। তিনি উড়িয়া, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পার্শীভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় ব্যবসায় কার্য্যের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। মাণিকরাম ব্যবসায় কার্য্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। তিনিও ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অনেক ভূসম্পত্তি করেন। তিন পুত্র রাখিয়া ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে মাণিকরাম মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্র তিনটীর নাম দয়ারাম, জগন্নাথ ও রঘুনাথ। দয়ারাম ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। মাণিকরামের দ্বিতীয় পুত্র জগন্নাথ পিতার জমিদারী ও ব্যবসায়াদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তখন বালেশ্বর জেলা ইংরেজের অধীন ছিল। জগন্নাথ তখনকার বালেশ্বর মহকুমার কোষাধ্যক্ষ হন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথ মৃত্যুমুখে পতিত হন। রঘুনাথও ব্যবসায় করিতেন। তিনি ইউরোপখণ্ডে সুন্দর “সান” নামক কাপড় রপ্তানী করিতেন। তাহা ছাড়া ঘি ও কড়ির তাঁহার বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল। তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি জনসাধারণের উপকারার্থে সরোবর খনন, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। তাঁহার চারি পুত্র—(১) ব্রজমোহন (২) রূপচরণ (৩) সনাতন (৪) শ্যামানন্দ। ব্রজমোহন ও রূপচরণ পিতার জীবদ্দশাতেই মারা যান : সনাতন পিতার মৃত্যুর এক মাস পরে মারা যান। সনাতনের এক পুত্র

রাধানাথ। রাধানাথ ১৬ বৎসর বয়সে মারা যান। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের মৃত্যু হওয়ায় শ্যামানন্দ পিতৃসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার উপর যখন সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পড়ে তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৬ বৎসর। তিনি বহু যত্ন ও পরিশ্রমের বলে পিতৃসম্পত্তির বিস্তৃতি সাধন করেন। শ্যামানন্দ এডুকেশন ও রোডসেস সোসাইটীর এবং লোকাল মিউনিসিপালিটীর সভ্য ছিলেন। শ্যামানন্দ অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। দানের ও নানাবিধ সৎকার্য্যের জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ১৮৬৬ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি প্রচুর পরিমাণে দান করিরাছিলেন। সেই সময়ে তিনি ক্ষুধার্ত্ত নর-নারায়ণের সেবার জন্য একটী অন্নছত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করিতে থাকেন। ব্রহ্ম ও আরাকান হইতে প্রভুত পরিমাণে চাউল আনিয়া তিনি তাঁহার আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রজাবর্গের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি প্রজাবর্গের এক লক্ষ টাকা কর মাপ করিয়াছিলেন। সে সময়ে যদি তিনি মুক্তহস্তে দানের জন্য অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে কত লোক যে অনাহারে মারা যাইত তাহার আর ইয়ত্তা নাই। গুণগ্রাহী গবর্মেণ্টও তাঁহার বদান্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি আপন সহরে নিমকালী ও ঝারেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রিমুনার গোপীনাথ মন্দির তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। পুরীর জগন্নাথ-মন্দির একবারে ভগ্নদশায় উপস্থিত হইয়াছিল, শ্যামানন্দ তাহার সংস্কার করিয়া মন্দিরটীকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন। এই মন্দিরের সংস্কারকল্পে শ্যামানন্দ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি এই সৎকার্য্যটী এত সংগোপনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রকন্যাগণও জানিতে পারেন নাই। তাঁহার

দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করিত, তাহা তাঁহার বামহস্তও জানিতে পারিত না।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দরিদ্রদিগকে কাপড় ও চাউল বিতরণের জন্য ৫ হাজার টাকা ব্যয় করেন। একটী পুষ্করিণী খননের জন্য তিনি বহু টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং সহরে ও মফঃস্বলে তিনি যে কত কূপ খনন করিয়াছিলেন তাঁহার আর ইয়ত্তা নাই। তিনি নিম্ন-লিখিত দানসমূহ করিয়াছিলেন :—(১) ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সহরে নিজ নামে একটি দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা (২) ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রিমুনায় একটী মধ্য ছাত্রবৃত্তি স্কুল প্রতিষ্ঠা (৩) ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া জুবিলী এম্-ই স্কুল প্রতিষ্ঠা (৪) ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বালেশ্বর জেলা স্কুলে যুবরাজের নামে কয়েকটি জুনিয়র বৃত্তি দেওয়া। এই ফণ্ডের টাকা দিয়া ভদ্রকে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (৫) বালেশ্বর রাজবাটীর সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা (৬) তীর্থযাত্রী, সাধু-সন্ন্যাসীদের পালনের জন্য ‘ সদাব্রত” নামক অন্নভাণ্ডার ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা (৭) ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পরুপাড়ায় একটি উদ্যান-বাটিকা নির্ম্মাণ।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে “রায় বাহাদুর”, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে “রাজা” ও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে “রাজা বাহাদুর” উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহাকে রাজা বাহাদুর উপাধি বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। ৭১ বৎসর বয়সে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি মারা যান।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিধবা রাণীও মারা যান।

রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুর দুই পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া মারা যান; পুত্রদ্বয়ের নাম—কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে (পরে রাজা বাহাদুর) ও কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া শ্যামানন্দের শ্রাদ্ধ হয়। তদুপলক্ষে নানা দেশাগত পণ্ডিত-মণ্ডলী

ইহাদিগকে "দেব" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর জন্ম গ্রহণ করেন। স্থানীয় জেলা স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন। আঠার উনিশ বৎসর বয়স হইতেই তিনি জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতে থাকেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিন বৎসর তিনি যোগ্যতার সহিত ঐ কাজ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রোডসেস কমিটির ভাইস্-চেয়্যারম্যান ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জেলাবোর্ড স্থাপিত হওয়া অবধি তিনি বালেশ্বর জেলা-বোর্ডের ভাইস্-চেয়্যারম্যান হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৮৮৩—৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা প্রদর্শনীর জন্য বহু শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করেন। এই কারণে ও উড়িষ্যার রিপণ। মানচিত্র রচনা করায় তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। উড়িষ্যাবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। নিম্নলিখিত সম্মানিত পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন ঃ—

(১) বালেশ্বর জেলা বোর্ডের ভাইস্-চেয়্যারম্যান।

(২) প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট।

(৩) লোক্যাল মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার।

(৪) বঙ্গীয় রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য।

(৫) বৌদ্ধ টেক্সট্ সোসাইটির সভ্য।

(৬) ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা পশুশালার আজীবন সভ্য।

(৭) ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কাউণ্টেস অব্ ডাফরিন্ ফণ্ডের আজীবন কৌন্সীলর।

(৮) ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় জেলের বে-সরকারী সভ্য নিযুক্ত হন।

(৯) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের মেম্বর (১৮৮৩) ; ১৮৯৭—১৯০০ পর্য্যন্ত এই এসোসিয়েসনের ভাইস-চেয়ারম্যান-পদে কার্য্য করেন।

(১০) বালেশ্বর সংস্কৃত সমিতির সভাপতি।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন। স্থানীয় স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দেব মে মাসে তিনি বালেশ্বর লোকাল বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের প্রতিনিধি হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কুমার সত্যেন্দ্রনাথ মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্ব্বাচিত হন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি খুব যোগ্যতার সহিত ঐ কার্য্য করেন। ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ রিলিফ ফণ্ডের স্থানীয় শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডায়মণ্ড জুবিলী কমিটীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। জুবিলী যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সেজন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিযাছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে মহারাণীর নামীয সার্টিফিকেট অব অনার দেওয়া হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লোকাল মিউনিসিপাল সার্কেলের সেন্‌সাস্‌-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হন। ৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বালেশ্বরের প্লেগ ভিজিলেন্স কমিটীর সভ্য হন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি বালেশ্বর সংস্কৃত সমিতির জয়েণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত পদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন :—

(১) বালেশ্বর জেলা বোর্ডের মেম্বর।

(২) অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট।

(৩) লোকাল মিউনিসিপ্যালিটীর মেম্বর।

(৪) বৌদ্ধ টেক্সট সোসাইটির মেম্বর।

(৫) পাইকপাড়া নার্সারি গার্ডেনের আজীবন সভ্য।

দুই সহোদরের মধ্যে রাজা বৈকুণ্ঠনাথের কোন সন্তানাদি নাই। কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দের একমাত্র পুত্রের নাম মন্মথনাথ। তাঁহার তিনটী কন্যা। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মন্মথনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সম্প্রতি "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইযাছেন।

দুই সহোদর পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত সমস্ত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান যে কেবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা সেইসমস্তেব আরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা নিম্নলিখিত জনহিতকর কার্য্যসমূহ করিযাছেন ঃ—

(১) সুপেয় জলাশয় খনন করিবার জন্য "শ্যামসাগর ফণ্ড" স্থাপন। (২) চাঁদবালি হাঁসপাতালে ঔষধ বিতরণের জন্য "রাণী শ্রীমতী ফণ্ড" স্থাপন (৩) বেলি পদক (৪) নালকুল রাস্তা নির্ম্মাণ (৫) অনন্তপুর মধ্য ছাত্রবৃত্তি স্কুল প্রতিষ্ঠা (৬) শোরে ইলিয়ট দাতবা ঔষধালয প্রতিষ্ঠা (৭) সহরে মাযের নামে শ্রীমতী ফিমেল দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা (৮) বালেশ্বর আলবার্ট ভিক্টর দাতব্য ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠা (৯) সহরে "রাণীসাগর" নামক সরোবর খনন (১০) স্মিথ প্রাইজ ফণ্ড (১১) রাজা শ্যামানন্দ বৃত্তি ফণ্ড (১২) বিদ্যাসাগর বৃত্তি (১৩) রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্যায়াম মেডাল (১৪) কেন্দ্রপাডা পাবলিক লাইব্রেরী (১৫) লেডী ডাক্তারদের আবাসস্থান নির্ম্মাণ (১৬) ১৭ মাইল-ব্যাপী রাস্তায় বৃক্ষরোপণ (১৭) অনেক উড়িয়া স্কুল বই ও উড়িষ্যা ভাষায় ম্যাপ প্রকাশ। এই সমস্ত বহি ও ম্যাপ খুব অল্প দামে বিক্রীত হওয়ায় দরিদ্র ছাত্রদের বড়ই উপকার হইয়াছে। (১৮) জগন্নাথ ট্রাঙ্ক রোড়ের পার্শ্ব দিয়া ৪৯টী কূপ খনন এবং চাঁদবালি ও অন্যান্য স্থানে নূতন নূতন কূপ খনন।

(১৯) মেদিনীপুরে বেলি হ্রদ নির্ম্মাণ ও বালেশ্বরে কৃষ্ণদাস পাল স্মৃতিমন্দির-নির্ম্মাণে চাঁদা দান।

(২০) নিম্নলিখিত দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে সাহায্য :—

(ক) ১৮৭৩ সালের মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষে।

(খ) ১৮৭৭ সালের পুরী দুর্ভিক্ষে।

(গ) ১৮৮০ সালের আইরিস দুর্ভিক্ষে।

(ঘ) ১৮৮৯ সালের নয়ানন্দ দুর্ভিক্ষে।

(ঙ) ১৮৯০ সালের তালপাড়া দুর্ভিক্ষে।

(চ) ১৮৯০ সালের ভোগ্রাই দুর্ভিক্ষে।

(ছ) ১৮৯১ সালের কামরদা দুর্ভিক্ষে।

(জ ১৯০০ সালের ভারতীয় দুর্ভিক্ষে।

বালেশ্বর রাজপরিবার ধর্ম্মকার্য্য ও অন্যান্য ব্যাপারে অকাতরে যে সমস্ত দান করিয়াছেন সে সকলের উল্লেখ করিতে গেলে একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। তবুও এস্থলে গুটিকয়েক প্রধান প্রধান দানের উল্লেখ করা গেল :—

স্বপ্নেশ্বর প্রভৃতি মন্দির নির্ম্মাণে ১,১৩,৮০০৲ টাকা। বালেশ্বর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়াদিতে বার্ষিক সাহায্য দেন ১৫৫০৲ টাকা। দাতব্য চিকিৎসালয়ের নির্ম্মাণে ১৭,১৮০৲ টাকা দিয়াছেন। লাইব্রেরী ও ক্লাব নির্ম্মাণে ৮৬৫০৲ টাকা; রাস্তা নির্ম্মাণে ৪১০০৲ টাকা; বৃক্ষাদি রোপণে ১২০০৲, দান ৯৭৫৭৲ টাকা। ইহা ছাড়া শ্যামানন্দ বৃত্তিবাবদ বৎসরে ৪০৲ টাকা দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষে বালেশ্বর রাজদরবার এ পর্য্যন্ত ১,০৬,৪৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটীর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে ৪,০৮৪৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। পুষ্করিণী প্রভৃতি খননে ৩৫,৪০০৲, কূপ খননে ৩,৬২০৲। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে বার্ষিক ব্যয় হয় ১৫০০৲। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে একটী শিল্প-প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইহাদের বদান্যতা, সদনুষ্ঠান প্রভৃতি দর্শনে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হইতে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত ইঁহাদিগকে অনেক প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

বনেলী রাজবংশ

বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জিলার অধীন বনেলীর রাজবংশ একটী প্রাচীন জমিদার-বংশ। এই বংশের পূর্ব্ব-ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন, তজ্জন্য ধারাবাহিক বিবরণ-প্রকাশের লোভ সম্বরণ করা হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য গুর্খাদিগের অত্যাচার হইতে নেপালের সন্নিকটবর্ত্তী উত্তর ভারতের অধিবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস্ বাহাদুর নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেই সংগ্রামে যেসকল ভারতবাসী ব্রিটিশরাজের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নেপালের প্রান্তবর্ত্তী পূর্ণিয়া জেলার অধীন বনেলী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দুলার সিংহের নাম বিশিষ্টভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বীরত্ব, রাজভক্তি ও সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

দুলার সিংহের পরলোক-গমনের পর তদীয় পুত্র রাজা বেদনানন্দ সিংহ বাহাদুর পিতৃপদে সমাসীন হন। তিনি খড়্গপুরের মুসলমান নরপতিদিগের বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বেদনানন্দ সিংহ ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

অতঃপর তৎপুত্র লীলানন্দ সিংহ বনেলী রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। তিনি পিতৃপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ব্রিটীশরাজের বিশেষ সহায়তা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি নানাপ্রকার সদ্গুণসম্পদে বিভূষিত থাকিয়া সকল শ্রেণীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজা লীলানন্দ মৃত্যুকালে তিন পুত্র রাখিয়া যান—পদ্মানন্দ, কালানন্দ এবং কীর্ত্ত্যানন্দ সিংহ বাহাদুর।

তৎপরে লীলানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র পদ্মানন্দ সিংহ পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার পদমর্য্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর হইল রাজলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

পদ্মানন্দের মৃত্যুর পর কালানন্দ ও কীর্ত্ত্যানন্দ সিংহ এই বংশের গৌরব রক্ষা করেন। রাজা কালানন্দ সিংহ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যানুরাগী পুরুষ। সঙ্গীত-বিদ্যা ও মৃগয়াতে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ। ব্যবহার-শিল্পের অনেক বিষয়ে তাঁহার ব্যুৎপত্তি দেখা যায়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারত-সম্রাটের স্মৃতিভাণ্ডারে তিনি ১৫,০০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে ভারতশ্বের মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের অভ্যর্থনা-আয়োজন-কল্পে চাঁদায় যে অর্থসংগ্রহ হয় তাহাতে রাজা বাহাদুর এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা উভয়ে ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন।

রাজা কালানন্দ সিংহ এবং মাননীয় রাজা কীর্ত্ত্যানন্দ সিংহ বাহাদুর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আর্য্যশাস্ত্রের 'রীডার" নিয়োগ জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে অর্থশাস্ত্রের জন্য একটি স্বতন্ত্র পাঠাগার-প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু অর্থ দান করিয়াছেন। রাজা কালানন্দের দুই পুত্র—রামানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ সিংহ বাহাদুর।

রাজা কীর্ত্ত্যানন্দ সিংহ বাহাদুর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর বনেলী রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পূর্ণিয়া জিলা স্কুলে বিদ্যারম্ভ করিয়া এলাহাবাদ মুর সেণ্ট্রাল কলেজ হইতে তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কীর্ত্তানন্দই বিহারের আভিজাত্য গৌরবে গৌরবান্বিত উচ্চ ধনী ভূস্বামীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম গ্রাজুয়েট্। ইনি ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, ও উর্দ্দু ভাষায় অনর্গল কথোপকথন করিতে পারেন। ইনি ক্রীড়া-কৌতুক, মৃগয়া, সঙ্গীতচর্চ্চা, গ্রন্থরচনা, বিজ্ঞানসেবা ও শিল্পনৈপুণ্যে

শারীরিক ও মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। ইনি বাঙ্গালী যুবকদিগকে লইয়া পূর্ণিয়াতে একটি ফুটবলের দল গঠন করিয়াছেন। ইনি শিল্প ও সাহিত্য-চর্চ্চায় উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহাকে আশ্রয় ও অবলম্বন করিয়া বহু লেখক সাহিত্য-সেবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশের নানাপ্রকার সৎকার্য্যে ও সভাসমিতিতে ইঁহার যোগদান দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। অধুনা বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার ইনি একজন বিশিষ্ট সভ্য। বিহারের উচ্চশিক্ষার উন্নতিকল্পে বনেলীরাজ হইতে ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে প্রায় ছয়লক্ষ টাকা সাহায্য দান করা হয়। বাঁকিপুর হইতে প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা "বিহারী" বনেলীরাজের পৃষ্ঠ-পোষকতায় স্থাপিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মহামান্য ভারত-সম্রাটের জন্মতিথি-উপলক্ষে কীর্ত্ত্যানন্দ সিংহ ব্যক্তিগতভাবে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিহারের খ্যাতনামা মাননীয় রায় শিবশঙ্কর সহায় C. I. E. বাহাদুরের কার্য্যকুশলতায় এই রাজ্যের বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

হাতোয়া রাজবংশ

হাতোয়া রাজবংশ "বাগোছিয়া" বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ। ইঁহারা ত্রিকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ ; সাধারণতঃ ইঁহাদিগকে ভূঁইয়ার ব্রাহ্মণ বলে। পরশুরাম নিক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয় রাজাদের শূন্য স্থানে যেসমস্ত ব্রাহ্মণ রাজাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন ইহারা সেই ব্রাহ্মণদিগের বংশধর। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জপ তপস্যা করায় জমি প্রভৃতি জায়গীর পাওয়ায় তাঁহাদিগকে ভূঁইয়ার ব্রাহ্মণ বলে। সৎ ব্রাহ্মণেরা যেভাবে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ইঁহারাও সেইরূপ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কাশীর রাজা, বেতিয়ারাজ, টিকারীরাজ, হাতোয়া-রাজ, তামকুই-রাজ, সেওহার রাজা, লালগোলার রাজা, ধানবারের রাজা সকলেই ভূমিয়ার-জাতীয় ব্রাহ্মণ।

উৎপত্তি

এই বংশের আদিপুরুষ রাজা বীর সেন হইতে বর্ত্তমান মহারাজা ১০৩ সংখ্যক বংশধর। বুদ্ধদেবের সময়ে ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে এই বংশ রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। রাজপুত চারণদিগের কবিতা হইতে এই বংশের ইতিহাসের কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। এই বংশের ৯৯ সংখ্যক রাজা ফতে সাহী ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তদবধি এই বংশের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়। এই বংশের ৮৬ সংখ্যক রাজা কল্যাণমল প্রথমে মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি আপন নামানুসারে কল্যাণপুর নামক একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া সেখানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। এই কল্যাণপুরে এখনও তাঁহার দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও একটি প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ কূপের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। সম্রাট্ আকবরের সময়ে ১৬০০ শত

খৃষ্টাব্দে রাজা টোডরমল্ল যখন বঙ্গের রাজপ্রতিনিধি তখন কল্যাণ-মল জরিপ কার্য্যে রাজা টোডরমল্লকে সহায়তা করায় সম্রাট্ আকবর তাঁহাকে "মহারাজা" উপাধি প্রদান এবং কল্যাণপুর পরগণা তাহার নামে নামকরণ করেন।

ক্ষেমকরণ সাহী

তাহার পর সপ্ত অশীতি সংখ্যক রাজা ক্ষেমকরণ সাহী মহারাজা বাহাদুর ও সাহী এই উভয় উপাধিই প্রাপ্ত হন। তিনি কল্যাণপুর হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া হাসিপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ওয়ারেণ হেষ্টিংস হাসিপুর রাজধানী ধ্বংস করিয়া দেন। হাসিপুর ধ্বংসের পর এই বংশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। বড় তরফের বিদ্রোহী মহারাজা ফতে সাহী তামকুহিতে রাজধানী স্থাপন করেন, আর ছোট তরফের বসন্ত সাহীর বংশধর হাতোয়ায় রাজধানী স্থাপন করেন। হাসিপুর দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। মহারাজা ফতে সাহী বসন্ত সাহীকে হত্যা করেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। যে স্থানে বসন্ত সাহী হত হন সেই উদ্যান "মুরকাতিয়া বাগ" নামে এখনও পরিচিত আছে। প্রকাশ, ফতে সাহী বসন্ত সাহীকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য তাঁহার সহিত যোগদান করিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু বসন্ত সাহী নাকি কোন মতেই রাজশত্রু হইতে স্বীকার করেন না। বসন্ত সাহীর পত্নী স্বামীর মুণ্ড ক্রোড়ে করিয়া চিতানলে দেহ ত্যাগ করেন এবং বলিয়া যান, তাঁহাদের কোন বংশধর যেন ফতে সাহীর সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ না রাখে। এখনও হাতোয়ার মহারাজগণ ফতে সাহীর বংশধরদিগের অধিকৃত স্থান গোরক্ষ-পুর জেলা দিয়া যাইবার সময় এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত পান করেন না। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফতে সাহী বিদ্রোহভাবাপন্ন ছিল এবং তাহার ভয়ে

সন্নিকটবর্ত্তী সমস্ত গ্রামের অধিবাসিগণ থর থর করিয়া কাঁপিত। বসন্ত সাহীর মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র মহেশদত্ত সাহী ভারতুহির ধাজু সিংহের অভিভাবকত্বে জমিদারী তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। ধাজু সাহী মহেশদত্ত সাহীকে লইয়া ফতে সাহীকে ধরিবার জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। এদিকে ফতে সাহী ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে দুর্বৃত্তের জীবন যাপন না করিয়া গোরক্ষপুরের জমিদারী ত্যাগ করিয়া অযোধ্যার নবাবের রাজ্যে শান্তির সহিত বাস করিতে থাকেন। ১৮ বৎসর দুর্বৃত্তের জীবন যাপন করিবার পর ফতে সাহী "ফকিরি" ব্রত গ্রহণ করেন। ফতে সাহীর পুত্রেরা তার পর ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহ লাভের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ফতে সাহীর কনিষ্ঠ পুত্র সারণের সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ মণ্টগোমারির নিকট আবেদন করেন যে, ফতে সাহীর পক্ষে হাসিয়ারপুরের রাজস্ব দিতে তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হউক। কিন্তু মিঃ মণ্টেগোমারি তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। ১৮০৬ ও ১৮২১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ঐরূপ দরখাস্ত করা হয়, কিন্তু কোনই ফল হয় না। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ফতে সাহীর প্রপৌত্র রাজস্বত্ব পাইবার জন্য মোকদ্দমা আনেন ; কিন্তু সে মোকদ্দমা ডিসমিস হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় মোকদ্দমা হয়, কিন্তু সে মোকদ্দমায়ও ফতে সাহীর পৌত্র পরাজয় লাভ করেন।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বাবু মহেশদত্ত সাহী হুসিয়ারপুরের জমিদারীর স্বত্ব পাইবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তথাকার রাজস্বত্ব পান, কিন্তু ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হঠাৎ মারা যান। তাঁহার অল্পবয়সে প্রথমে একবার বিবাহ হয়, সেই পরিবারকে পরিবারের পিতা না পাঠানোতে মহেশদত্ত পুনরায় বিবাহ করেন। সেই শেষোক্ত পরিবারের গর্ভে মহেশদত্তের মৃত্যুর পর মহারাজা ছত্রধারী সাহী বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন।

মহারাজা ছত্রধারী সাহী বাহাদুর

মহারাজা ছত্রধারী সাহীর হস্তে লর্ড কর্ণওয়ালিশ রাজ্যভার দেন। যতদিন মহারাজা ছত্রধারী নাবালক ছিলেন, ততদিন জমিদারী কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের হস্তে ছিল; তার পর মহারাজা ছত্রধারী সাবালকত্বে উপনীত হইলে জমিদারীর প্রকৃত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হন। ভারতুহী হইতে তিনি বর্ত্তমান হাতোয়ায় তাঁহার বাসভবন স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার শৈশব ও বাল্যের অভিভাবক ধাজু সিংকে তিনি হাতোয়ার "বজরগ" নামে একটি গ্রাম জায়গীর দান করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি দেন। মহারাজা ছত্রধারী সাহীকে সকলেই ভক্তি করিত। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৭—৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে প্রভূত সাহায্য করেন এবং আপন জেলাতে বিদ্রোহ-দমনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার পুরস্কারস্বরূপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাহাবাদ জেলার বিদ্রোহী কুর সিংহের মহল প্রদান করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ই মার্চ্চ হাতোয়ায় মহারাজের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে গোরক্ষপুরের কলেক্টর কমিশনারকে লেখেন,—By the decease of the Maharaja of Hutwa the Government has lost a truly loyal subject অর্থাৎ মহারাজের মৃত্যুতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একজন প্রকৃত রাজভক্ত প্রজা হারাইয়াছেন। মহারাজা ছত্রধারী সংস্কৃত-শিক্ষার্থীদের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি বিখ্যাত স্বামী নিরঞ্জনকে অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন। স্বামীজীর তত্ত্বাবধানে তিনি একটি সংস্কৃত স্কুল পর্য্যন্ত খুলিয়াছিলেন। সেই স্কুলে প্রায় হাজার ছাত্র ভারতের নানাস্থান হইতে আসিয়া বিনা বেতনে

শিক্ষালাভ করিত। মহারাজা তাহাদিগকে আপন রাজকোষ হইতে আহার ও বাসস্থান দিতেন। মহারাজা নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। গণ্ডক ও ঘর্ঘরা নদীর তীরবর্ত্তী সমস্ত দেশটা তিনি পার্শা-রাজের নিকট হইতে পাইযাছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি রাজকোষে ৫০ লক্ষ টাকা রাখিযা যান।

মহারাজা রাজেন্দ্রপ্রতাপ সাহী বাহাদুর

মহারাজা ছত্রধারীর দুই পুত্র। কুমার রামসহায় সাহী ও পৃথ্বিপাল সাহী; ইঁহারা পিতার জীবদ্দশাতেই মারা যান। রামসহায় সাহীর দুই পুত্র;—উগ্রপ্রতাপ সাহী ও দেবরাজ সাহী। পৃথ্বিরাজ সাহীরও দুই পুত্র, তিলকধারী সাহী ও বীরপ্রতাপ সাহী। মহারাজা ছত্রধারী সাহীর মৃত্যুকালে এই চারি পুত্রই জীবিত ছিলেন। উগ্রপ্রতাপের পুত্র রাজেন্দ্রপ্রতাপকে মহারাজ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কাজেই মহারাজের মৃত্যুর পর রাজেন্দ্রপ্রতাপ সাহী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। রাজেন্দ্রপ্রতাপ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট সাহাবাদ জেলার বাজেয়াপ্ত গ্রামসমূহ প্রদান করেন। এই গ্রামসমূহের বার্ষিক আয় ২০ হাজার টাকা। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মহারাজা হাতোয়া দুর্গে একটী কামান রাখিবার ও গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রাইভেটভাবে প্রবেশ করিবার অধিকার পান। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি ডিউক অব্ এডিনবরাকে অভ্যর্থনা করিবার সৌভাগ্যলাভ করেন। মহারাজা ছত্রধারীর মৃত্যুর পর কুমার পৃথ্বীপাল সাহীর পুত্র তিলকধারী সাহী ও বীরপ্রতাপ সাহী জমিদারীর স্বত্ব পাইবার জন্য নালিশ রুজু করেন; কিন্তু আহার ও বাসস্থানের জন্য কয়েকখানি গ্রাম পাওয়ায় তিলকধারী সাহী মোকদ্দমার প্রত্যাহার করেন। বীরপ্রতাপ প্রিভি কৌন্সিল পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালান, প্রিভি কৌন্সিলের বিচারকগণ

বলেন যে, নিয়মানুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যের অধিকারী, কাজেই বীর-প্রতাপকে মাসিক মাসোহারা বাবদ এক হাজার টাকা দিবার আদেশ দেন।

এই বংশের কুলাচার বা প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যের উত্তরাধিকারী ও উপাধি প্রভৃতির অধিকারী হন, কনিষ্ঠপুত্র মাত্র মাসিক মাসোহারা বাবদ নগদ টাকা কিংবা ভূসম্পত্তি পান। এই প্রথা মহারাজ ফতে সাহীর পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল এবং প্রিভি কৌন্সিলের বিচারের দ্বারা এই প্রথা আরও দৃঢ়ীকৃত হয়। প্রিভি কৌন্সিলে যে মোকদ্দমা হয়, তাহাকে হাতোয়ারাজ-মোকদ্দমা বলে এবং এই মোকদ্দমায় মহারাজা রাজেন্দ্রপ্রতাপ সাহীর ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এই মোকদ্দমার মীমাংসা হইতে দশবৎসর লাগিয়াছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মহারাজা রাজেন্দ্রপ্রতাপ সাহী মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি কৃষ্ণপ্রতাপ সাহী নামক একটী পঞ্চদশবর্ষীয় নাবালক পুত্র রাখিয়া যান। মহারাজ কৃষ্ণপ্রতাপ নাবালক বলিয়া কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ হাতোয়া রাজ্যের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ তিন বৎসর এই জমিদারীর সুব্যবস্থা করিয়া ৪,৩৪,০০০৲ টাকা জমান। এই টাকার চারিভাগের তিনভাগ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিহার দুর্ভিক্ষের সময়ে ব্যয় করা হয়। এই সময়ে হাতোয়া রাজ্য জরীপ করা হয়।

মহারাজা স্যর কৃষ্ণপ্রতাপ সাহী বাহাদুর সি-আই-ই

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা কৃষ্ণপ্রতাপ সাহী সাবালক হন। ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে ছোটলাট দরবার করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাবু ভুবনেশ্বর দত্তের সুবন্দোবস্তে রাজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে। তাঁহার মৃত্যু হইলে বাবু বিপিনবিহারী বসু রাজ্যের ম্যানেজার নিযুক্ত হন এবং তাঁহার পরিচালনায় রাজ্যের সমধিক উন্নতি হয়। মহারাজা নিজে জমিদারীর মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া

তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি স্বরাজ্যে বহু পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। রায়তদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেন। তিনি দুইটি নীলের কারখানা তুলিয়া দিয়া খাদ্য-শস্যের চাষের প্রবর্ত্তন করেন। মহারাজা স্যর কৃষ্ণ-প্রতাপের রাজত্বকালেই হাতোয়া রাজ্য সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে উপনীত হয়। তিনি "কৃষ্ণ-ভবন" নামক বিস্তৃত সুরম্য প্রাসাদ রচনা করেন। তিনি দেশের যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। বিহার জমিদার-সভার তিনিই অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পরামর্শ অনেক সময়ে গ্রহণ করিতেন। তাঁহাকে অনেকবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করেন। ইংরাজী ও সংস্কৃতশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি অনেক সংস্কৃত পণ্ডিতকে ভরণ-পোষণ করিতেন। তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে "পরাশর গৃহ্যসূত্র" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "শোক-মুদ্গার" নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচনা। তাঁহার লাইব্রেরীতে এত দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল যে, এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্যেরা তাহা দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি কোটি কোটি টাকার উপর শুইয়া থাকিলেও মনে প্রাণে সন্ন্যাসী ছিলেন, গদিতে আরোহণ করিবার কিছুদিন পরেই তিনি উত্তর ভারতে যাইয়া সমস্ত তীর্থস্থান পরিদর্শন করেন। তিনি কাশীধামে যাইয়া প্রকাণ্ড অট্টালিকা, মন্দির ও ছত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে বাবার স্নানাধারটি রৌপ্য-বিমণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। হাতোয়ার ছত্রধারী সংস্কৃত স্কুলটির তিনি উন্নতি করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানগণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং হাতোয়ায় একটী অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাহা ছাড়া তিনি সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য কত যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন

অনেক কাঁচা পাকা রাস্তা তাঁহার পরোপচীকির্ষার পরিচয় দিতেছে। তিনি প্রজাদের খাদ্যের জন্য সুমিষ্ট আম্রফলের উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর শীতকালে তিনি দরিদ্রদিগকে শীতবস্ত্র দান করিতেন। তিনি মানুষকে দয়া করিয়া শুধু ক্ষান্ত ছিলেন না, অবলা প্রাণীসমূহও তাঁহার করুণার পাত্র ছিল। বৃদ্ধ ঘোড়া কিংবা গরু দিয়া কেহ কাজ করিতে পারিত না। প্রতি মাসের প্রথম তারিখে তিনি কর্ম্মচারীদিগকে বেতন দিতেন। সাধু, সচ্চরিত্র, শ্রমশীল কর্ম্মচারীকে তিনি স্বতন্ত্র পারিতোষিক দিতেন। স্বরাজ্যে তিনি ত প্রভূত দান করিতেন, তাহা ছাড়া তিনি বাঁকীপুর শিল্প-বিদ্যালয়ে ২৫ হাজার টাকা ও কাশী জলের কলে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষনিবারণকল্পে ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রভূত টাকা ঋণ দেন। আফগান যুদ্ধের সময় তিনি ২৫ হাজার টাকা ও সৈন্যগণের ব্যবহারের জন্য গরম কাপড় পাঠাইয়াছিলেন। অতিথি-সেবায় মহারাজ মুক্তহস্ত ছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে কলিকাতায় আসিলে তিনি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী দরবারে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৮৭৫।৭৬ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি দুইটি পদক পুরস্কার পান। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কে-সি-আই-ই উপাধি পান। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মহারাজের পাঁচ বৎসর বয়স্ক একটী শিশু পুত্র মারা যায়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর মহারাজ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৪০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি চারি বর্ষ বয়স্ক একটী পুত্র ও এক বৎসর বয়স্ক একটি কন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ তৃতীয়বার তাঁহার রাজ্যের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। বাঙ্গালার ছোটলাট সিভিলিয়ান মিঃ এ-এম্ মারুস্ম্যানকে রাজ্যের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন।

মহারাজা গুরুমহাদেবাশ্রমপ্রসাদ সাহী ও মহারাণী সাহিবা, কে-এইচ্-জি-এম্

মহারাজা গুরুমহাদেবাশ্রম প্রসাদ সাহী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৩৭ বৎসর। হাতোয়ার মহারাণী হিন্দু বিধবার ন্যায় আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কর্ম্ম পালন করিয়া বিধবার মত জীবন যাপন করিতেছেন। তিনি যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি সংস্কৃত ভাষাতেও অশেষ ব্যুৎপত্তিশালিনী। রাজ্য-পরিচালনা-ব্যাপারে তিনি বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন। ম্যানেজার, দেওয়ান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে তাঁহার মতামত গ্রহণ করেন, তদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের উচ্চ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ পর্য্যন্ত রাজ্য-শাসন-ব্যাপারে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। মহারাণী একদিকে যেমন হিন্দু-মন্দিরে অর্থদান করেন, অন্যদিকে তেমনি খ্রীষ্টানদের গির্জ্জা ও মুসলমানদের মসজিদেও অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। সমগ্র দেশের স্ত্রীলোকগণের রোগ-চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি অকাতরে অর্থদান করিতেছেন। লেডি ডাফ্রিণ ভিক্টোরিয়া জেনানা হাঁসপাতালে তিনি ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ছাপরা, পাটনা ও মজঃফরপুরে তিনি স্বতন্ত্র মহিলা হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মহারাণীর স্থবর্ণ জুবিলী উপলক্ষে তিনি হাতোয়ার ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল ১।।০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই হাঁসপাতালের সন্নিকটে "উড্বর্ণহোম" নামে অসহায় ও নিরাশ্রয়দের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মহারাণী অনেক দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নে গুটিকয়েক দানের উল্লেখ করা গেল :—

(১) ১৯০২ সালে দুর্ভিক্ষ-দমন ফণ্ডে ১,০০,০০০৲

(২) ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ১,০০,০০০৲

(৩) লেডি ডফরিণ জেনানা হাঁসপাতাল ৫০,০০০৲

(৪) ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্কলারসিপ ফণ্ড ৫০,০০০৲

(৫) রাঁচি কলেজ ফণ্ড ৪০,০০০৲

(৬) সৈন্য ও নাবিক পরিবার সমিতি ৩০,০০০৲

(৭) ছাপরা মহিলা হাঁসপাতাল ৩০,০০০৲

(৮) ফ্রেজার স্কলারসিপ ফণ্ড ৩০,০০০৲

(৯) মজঃফরপুর মহিলা হাঁসপাতাল ১৫,০০০৲

(১০) পাটনার মহিলা হাঁসপাতাল ১০,৮৪০৲

(১১) ট্রান্সভাল যুদ্ধ সাহায্য সমিতি ১০,০০০৲

মহারাণীর দাতব্য অনুষ্ঠানের জন্য মহারাণী রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে "কৈসর-ই-হিন্দ্" সুবর্ণপদক পুরস্কার দেন।

১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নাবালক মহারাজের "কানাও" উৎসব সম্পাদিত হয়। এই উৎসবে দ্বারভঙ্গাধিপ-প্রমুখ অনেক বড় বড় রাজা-মহারাজা উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এই উৎসবে ১,১২,৮৯১৲টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তাঁহার বিবাহ-উৎসব ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৪,৫৮,৫২৮৲ টাকা ব্যয়ে সমাধা হইয়াছিল। বিহারে এইরূপ উৎসব আর কেহ কখনও দেখে নাই। ১৪০জন সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক এই বিবাহ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং ছোটলাট স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার মহারাজের স্বাস্থ্য-পান করিয়াছিলেন।

হাতোয়ার মহারাণীর মত বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় দ্বিতীয় মহিলা আর আছেন কি না সন্দেহ।

বর্ত্তমান হাতোয়া

১৯০১ সালে যে লোকগণনা হয় তদনুসারে হাতোয়ার লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ৫০ হাজার। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে হাতোয়া রাজবংশ এখানে বাস করিতেছেন। ত্রিহুত বিভাগের মধ্যে হাতোয়া অন্যতম জেলা।

বিহারের মধ্যে হাতোয়ার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন সহর নাই। "হাতুয়া" রেল ষ্টেশনের তিন মাইল পশ্চিমে এই সহর অবস্থিত। হাতোয়া সমতলভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া নিকটে না গেলে ইহার শোভা-সম্পদ দৃষ্টিগোচর হয় না। সহরে প্রবেশমাত্রই কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের ম্যানেজারের অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার নিকটে রাজলাইব্রেরী, বিলিয়ার্ড রুম, ভোজকক্ষ ও ইহার বিপরীত দিকে গৃহশিক্ষকের বাটী। ইহার কিছুদূরে ইডেন হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত। স্কুলের বিপরীত দিকে রাজ-উদ্যান। উদ্যানের দক্ষিণ পশ্চিমে দুর্গ, রাজকোষ, হাওদাখানা ও তোষাখানা; উদ্যানের পশ্চিমে হাতোয়া বাজার। বাজারের পশ্চিমাংশে গোপালজীর মন্দির। মন্দিরের পশ্চিমে ও রাজপরিবারবর্গের বাসস্থানের পশ্চিমে ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল। ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতালের পশ্চিমে "উডবর্ণ হোম"। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের পশ্চিমে দরবার ঘর। এই ঘরে মহারাজ দশহরার দিন সমস্ত অভিজাত ও কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই ঘরে "ফুসলীর" দিনে অর্থাৎ বৎসরের প্রথম খাদ্যশস্য-বপনের দিনে প্রজারা মহারাজকে অভিনন্দিত করে। রাজপ্রাসাদের নিকট রাজেন্দ্রভবন। হাতোয়ার ১৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে হুসিযারপুর দুর্গ—হাতোয়ার মহারাজগণের প্রাচীন বাসভূমি। দুর্গের মধ্যে মহারাজা স্যর কৃষ্ণপ্রতাপ একটি বাংলো রচনা করেন। হুসিয়ারপুরের উত্তর-পূর্ব্বে "গোরক্ষিণী ক্ষেত্রে" হাতোয়া সহরের নিকট কোন নদী নাই; পাঁচ মাইল দূরে "ডাহা" নদী অবস্থিত। সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, পাটনা, সাহাবাদ, দার্জ্জিলিং, কলিকাতা, কাশী ও গোরক্ষপুরে হাতোয়া রাজের ভূসম্পত্তি আছে। ইহাদের জমিদারীতে পতিত জমি আদৌ নাই বলিলেই হয়—সকল জমিই উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। রাজ্যে বহু-সংখ্যক পুষ্করিণী আছে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে হাতোয়ার মহারাজা

প্রায় দুই হাজার কূপ খনন করিয়া দিয়াছেন। হাতোয়ার জলবায়ু ও স্বাস্থ্য অতি ভাল। এই রাজ্যে কোন পাহাড় নাই—মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ উচ্চ জমি দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্যে তিনটী দাতব্য ঔষধালয় আছে। এই রাজ্যের পরিধি সাতহাজার বর্গ মাইল। রাজ্যের মোট আয় বার্ষিক ১৪,৩২,৪৫৩৲ টাকা। হাতোয়া ছাড়া ছাপরা, পাটনা (দীঘা), কাশী, কলিকাতা, ফার্শি প্রভৃতি স্থানে বৃহৎ প্রাসাদ আছে।

রাজকোটের ঠাকুর সাহেব

ঠাকুর সাহেব স্যর লাখাজিরাজ ১৮৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন তাঁহার পিতা ঠাকুর সাহেব বাবাজি রাজ মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৮৯০)। তাঁহার নাবালক অবস্থায় পূর্ব্ব রাজার কর্ব্বাহরি পোলিটিকাল এজেণ্ট মহোদয়ের কর্তৃত্বাধীনে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। রাজকুমার কলেজে পড়িবার সময়ে তিনি পাঠে এতাদৃশ শ্রমশীলতাপূর্ণ আত্মনিয়োগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তাহাতে সকল শিক্ষকই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৯০৭ সালের ২রা অক্টোবর তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের গদীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি দুই বৎসর ধরিয়া রাজকীয় সৈন্যবাহিনীতে (Imperial Cadet Corps) সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৮-৯ সালে তিনি ইংলণ্ড পরিদর্শন করেন এবং তথায় পাঁচ মাস কাল অবস্থান করেন। ১৯১০ সালের ৫ই মার্চ্চ বর্ত্তমান ঠাকুর সাহেব ধর্ম্মেন্দ্র সিংজীর জন্মদিবস উপলক্ষে তিনি তাঁহার প্রজাদিগকে অনেকগুলি সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—বাকী খাজনা, অগ্রিম দেওয়া টাকার অতিরিক্ত সুদ এবং মিউনিসিপাল ট্যাক্স—এইগুলি মকুব; কৃষি এবং যন্ত্রপাতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতির জন্য বৃত্তিপ্রদান। ১৯১০ সালে তিনি প্রত্যেক বিভাগের প্রধান ব্যক্তিকে লইয়া একটী রাজসভা (State Council) স্থাপন করেন। রাজ্যের পরিচালন-কার্য্য আরও সুবিধাজনক করিবার জন্য এই সভায় প্রতি মাসে নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা হইত। ১৯১০ সালের জুলাই মাসে একটি রাজ ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছিল। এই ব্যাঙ্ক গত ১৯ বৎসরের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যকে খুব সাহায্য করিয়াছে। গত ১৯১২ সালের ডিসেম্বর

মাসে দিল্লীতে যে অভিষেক-দরবার হইযাছিল, তাহাতে ঠাকুর সাহেব যোগদান করিয়াছিলেন। গত মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিজের সৈন্য প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি উচ্চ শ্রেণীর নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার শাসনকালে সমস্ত রাজ্যেব কার্য্যাবলী নিজে পরিদর্শন করিতেন।

তাঁহার শাসনকালের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, তিনি ১৯২৩ সালে প্রজাদিগের প্রতিনিধি-সভা নামে একটি সভার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সকল শ্রেণীর প্রজাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত ৯০ জন সভ্য এই সভাতে থাকে।

১৯২৪ সালে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন এবং ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই বৎসর তিনি তাহার প্রজাদের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপনের আর একটি প্রমাণ দিয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মচারী ও প্রজাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত সভ্যদের লইযা গঠিত একটি সভার উপর রাজ-কার্য্য পরিচালনের ভার দিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি কাথিওযারের অন্যান্য রাজাদিগকে আর একটি উদাহরণ দেখাইয়াছিলেন। সমগ্র কাথিওযারের মধ্যে তিনিই একমাত্র প্রথম রাজা ছিলেন যিনি "কাথিয়াওয়ারের রাজনৈতিক সভা"র ও "কাথিয়াওয়ারের যুবক সভা"র প্রথম অধিবেশন হইতে দিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় রাজার ২২ বৎসরের সংক্ষিপ্ত শাসনের মধ্যে যে উন্নতি হইয়াছে তাহা অতীব প্রশংসনীয়। একটি কাপড়ের কল, ইলেক্ট্রিক উৎপাদনের বাটী (Electric Power House), ট্রামওয়ে, ময়দার কল, একটি কাঁসা প্রস্তুতের কারখানা, একটি লৌহ কারখানা, এবং অন্যান্য আরও নানা প্রকার শিল্পের সৃষ্টি তাঁহার সময়ে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার রাজ্যের শিল্পী ও কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একটি "রাসায়নিক

গবেষণাগার" (Chemical Research Laboratory) স্থাপন করেন। তিনি আরও একটি শিল্পসম্বন্ধীয় প্রদর্শনী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কৃষকদিগের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। কৃষি-সম্বন্ধীয় কতকগুলি পুস্তক দেশী ভাষায় লিখাইয়া তিনি গ্রাম্য স্কুলের ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে দিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে Rajkot State Chamber of Commerce এবং ব্যবসায়-সম্বন্ধীয় আরও কতকগুলি সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল।

সাধারণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধেও তিনি কম মনোযোগী ছিলেন না। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে পাঁচটী এলোপ্যাথিক ও দুইটী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় স্থাপিত হইযাছিল। ইহা ছাড়া গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা করিবার জন্য শিক্ষিত ডাক্তার ও বৈদ্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। রাজ-কোটে প্লেগের সময়ে ঠাকুর সাহেব নিজে রোগীদিগকে পরিদর্শন করিতেন এবং তাহাদের যথাযোগ্য চিকিৎসা হইতেছে কি না তাহা দেখিতেন। ইহা ছাড়া তাঁহার শাসনকালে শিক্ষা-বিভাগেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। সাধারণ বালক-বালিকাদের শরীরচর্চ্চার জন্যও তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

স্যর লাখাজিরাজ, কে-সি-আই-ই কাথিওয়ারের অন্তর্গত দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্য রাজকোটের অধিপতি ছিলেন। তিনি পল্লীগ্রামের কৃষক-দিগকে পরিদর্শন করিতে গিয়া রাজকোটের অন্তর্গত মাহুদি গ্রামে সর্দ্দি দ্বারা আক্রান্ত হন। তখনই তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদ্-যন্ত্রে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে। চিকিৎসার জন্য তৎক্ষণাৎ টেলিফোন-যোগে রাজকোটে সংবাদ দেওয়া হয়। ৬শে জানুয়ারী রবিবার (১৯৩০ খৃঃ) রাজকোটের প্রেসিডেন্সি সার্জ্জেন মেজর জে বি হান্স, সি-এস, তাঁহাকে রাজধানী রাজকোটে ফিরাইয়া আনেন। রাজকোটে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়।

বোম্বাই হইতে নার্স আনয়ন করা হইয়াছিল এবং নানা প্রকার চিকিৎসা করা সত্ত্বেও শনিবার তাঁহার অবস্থা আরও খারাপ হয়। গত ২রা ফেব্রুয়ারী রবিবার বেলা ১২টা ৩০ মিনিটের সময় তাঁহার জীবন-বায়ু নির্গত হয়। তিনি দুই পুত্র, যুবরাজ শ্রীধর্ম্মেন্দ্র সিংজী (রাজকোটের বর্ত্তমান ঠাকুর সাহেব) ও কুমার শ্রীপ্রদ্যুমন সিংজী এবং রাণী শ্রীমিনাপুরওয়ালা—এই তিন জনকে রাখিয়া গিয়াছেন।

রাজার মৃত্যুসংবাদে রাজকোটের প্রজারা অতীব আশ্চর্য্য এবং মর্ম্মাহত হইয়াছিল। তাহারা তখনই সমস্ত বাজার হাট প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাহাদের প্রিয় রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য প্রাসাদের দিকে গমন করিতে লাগিল। প্রাসাদ হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত রাস্তাগুলি আবালবৃদ্ধ-বনিতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

রাজার খারাপ অবস্থার কথা শুনিয়া পশ্চিম ভারতের রাজ্যসমূহের গভর্ণর-জেনারলের এজেন্ট মিঃ ই এইচ কীলি তাঁহার প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমান ঠাকুর সাহেবকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রাসাদের মূল্যবান্ দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য ধনাগার শিলবদ্ধ করিয়াছিলেন। বিকাল প্রায় ৩টার সময় প্রথামত যুবরাজ ধর্ম্মেন্দ্র সিংজীর তিলক-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল।

রাজকোট রাজ্যের সমস্ত অফিস ও বাজার ৪ দিনের জন্য বন্ধ ছিল। গ্রাম হইতে লোকগণ এবং অন্যান্য রাজ্য হইতে প্রতিনিধিগণ সান্ত্বনা প্রদানের জন্য আগমন করিয়াছিল। কাথিওয়ারের অন্যান্য রাজাদের মধ্যে নবনগরের জাম সাহেব, গোণ্ডলের মহারাজা সাহেব, মহামান্য মহারাজা স্যর শ্রীভগবৎ সিংজী এবং ওয়াংকানারের রাজা সাহেব, মহামান্য রাজা সাহেব স্যর শ্রীঅমর সিংজী বর্ত্তমান ঠাকুর সাহেবকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রাজকোটে আসিয়াছিলেন।

স্তর লাখাজিরাজের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের জন্য এবং রাজ-পরিবারের প্রতি সান্ত্বনা দিবার জন্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এক বহুজনপূর্ণ সাধারণ সভা হইয়াছিল। ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন রায় বাহাদুর হরজীবন ভাই। সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সকল বয়সের এবং সকল দলের লোক দলে দলে আসিয়া করন্ সিংজী মিডিল স্কুলের প্রাঙ্গণে আসিযা সমবেত হইয়াছিল এবং ৪টার সময় প্রায় ১০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। রায় বাহাদুর কোটক মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায স্বর্গীয রাজার নানা সৎকার্য্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় রাজার স্মৃতিরক্ষা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইলে সভার মধ্যে হইতে খুব উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া গেল, এবং সভার মধ্যেই প্রায় ১০,০০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে এইচ্ সি চৌধ্রী ১০০০৲ টাকা এবং আর বি কোটক ৫০১৲ টাকা দিয়াছেন। অর্থসংগ্রহের জন্য একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালা ১২৪৬ সালের মাঘমাসে (ইংরাজী ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী) শশিপদবাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম গঙ্গামণি। তাঁহার পিতা একজন স্বদেশ-হিতৈষী ছিলেন। চারি ভ্রাতার মধ্যে শশিপদবাবু তৃতীয়। শশিপদবাবুর জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতাই অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যে বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশে বরাহনগরে শশিপদবাবু জন্মগ্রহণ করেন তাহার আদিনিবাস পূর্ব্বে বাঙ্গালার বিক্রমপুর পরগণার ব্রজযোগিনী গ্রামে ছিল।

শশিপদবাবুর বয়স যখন পাঁচ বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। বাল্যে শশিপদবাবু সাধারণভাবে গ্রাম্য পাঠশালায় ও পরে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি

সাংসারিক অস্বচ্ছলতা নিবন্ধন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন। শশিপদবাবু কুলীনের সন্তান হইলেও বিবাহে পণগ্রহণ করেন নাই। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে শশিপদবাবুর প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। এই শিশু সূতিকা-গৃহে ইহলীলা সম্বরণ করে। শশিপদবাবু ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সূতিকাগৃহের কদর্য্যতা দূর করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

বাল্যকাল হইতেই শশিপদবাবু কথকতা-শ্রবণে বড়ই অনুরাগী ছিলেন। ভিক্ষুকদিগের ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত-শ্রবণেও শশিপদবাবুর অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। উপনয়ন-সংস্কার হওয়ার পর হইতেই শশিপদবাবুর মনে আধ্যাত্মিক উপাসনার ভাব আপনা আপনি জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাল্যে তিনি পুষ্প, নৈবেদ্য, তুলসী, দুর্ব্বা দিয়া অতি ভক্তি-ভরে ঠাকুরপূজা করিতেন; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই সমস্ত পূজা অনাবশ্যক দেখিয়া তাঁহাদের কুলগুরু ভট্টপল্লী-নিবাসী পণ্ডিত ৺কৃষ্ণহরি শিরোমণির শরণাপন্ন হন। শিরোমণিমহাশয় তাঁহাকে "আনন্দং ব্রহ্মেতি" মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শশিপদবাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন ও বরাহনগরে একটী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সমাজচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার উপর নানারূপ সামাজিক উৎপীড়ন হইতে থাকে। তাঁহার জল বন্ধ হয়—ধোবানাপিত ও নৌকা বন্ধ হয়, কেহ কেহ বা তাঁহার প্রাণ-নাশের চেষ্টা করিতে থাকে, অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া পিতৃপুরুষের বাসস্থান ত্যাগ করেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় শশিপদবাবু সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বহু যত্নে যে সমস্ত পুত্রকন্যাকে প্রতিপালন করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন এ প্রকারের অনেক পুত্র-কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু কেহ কখনও তাঁহাকে শোকে বিচলিত হইতে দেখে নাই। মৃত্যু দারিদ্র্য অপমান কিছুই তাঁহাকে বিচলিত

করে না। প্রত্যক্ষ ও প্রেমময় ভগবানের প্রতি প্রেমযুক্ত বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ।”

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আজীবন দেশের লোকের সেবা করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার বিপক্ষ, যাঁহারা পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে তাঁহার অনিষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, এরূপ লোকেরও যে তিনি কত সময়ে কত সাহায্য করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

তি'ন সুরাপান-নিবারণী সভার সম্পাদক ছিলেন। তিনি যে কত পতিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে সৎপথে আনিতে সহায়তা করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে শশিপদবাবু কলিকাতায় “দেবালয় সমিতি” নামে একটি ধর্ম্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন। দেবালয় সর্ব্ব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মিলনমন্দির।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে শশিপদবাবু বরাহনগরে “সামাজিক উন্নতি-সাধিনী সভা” (Social Improvement Society) স্থাপন করেন। তিনি বরাহনগর কলের শ্রমিকদিগের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত গমন করেন, তথায় কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের প্রভাব তাঁহার জীবনে পতিত হয় এবং National Indian Associatio। এর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘটে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি “সাধারণ ধর্ম্মসভা” নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য, এই সভা হইতেই বর্ত্তমান দেবালয়ের সূত্রপাত। শশিপদবাবু বরাহনগরে আরও দুইটী জনহিতকর কার্য্য করেন; একটি শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউট, দ্বিতীয়টী বিধবাশ্রম।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিসূচিকা রোগে শশিপদবাবুর মাতার মৃত্যু হয়। তখন তিনি সালকিয়া স্কুলের শিক্ষক। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে শশিপদবাবু বরাহনগরে একটি সুরাপান-নিবারণী সভা স্থাপন করেন। তিনি সুরাপাননিবারণী সভা স্থাপন করিয়া স্বয়ং সুরাপায়ীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন। দিনরাত্রি আর বিশ্রাম নাই, অন্য চিন্তা নাই। সুরাপায়িগণ নিজেদের আড্ডায় বসিয়া সুরাপান করিতেছে, নানারূপ আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, এমন সময় শশিপদবাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সুরাপায়িগণকে নানাপ্রকার মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি আশা-সমিতি (Band of Hope) নামক এক সম্প্রদায়ের সদস্যগণের সহিত আন্তরিকতা সহকারে সুরাপান-নিবারণ-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার চেষ্টার যে কিরূপ ফল ফলিয়াছিল তাহা মিঃ কেনের এই মন্তব্য হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় :—During the first year of the Society's existence, upwards of twenty men were rescued from intemperance and rice. Gradually most of the known drunkards gave up their habits and many of them joined a Reading Club formed by Mr. Banerjee on the very site where there was formerly a drinking club.

শশিপদবাবু আজীবন জাতীয়ভাবে স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি আপন গৃহে প্রথমে স্ত্রীশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রথম ছাত্রী। তিনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পুস্তক-প্রচারের জন্য এক পুস্তকাগার (Female Circulating Library) প্রতিষ্ঠা করেন। বালিকারা সকলে বাড়ীতে পড়িবে, তার পর তাহাদের পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে, এজন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন।

নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা প্রায়ই অল্পবেতনে কর্ম্ম করিয়া অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, বিধবাদিগের জন্য আশ্রম

প্রতিষ্ঠা করিয়া শশিপদবাবু এইদিকে মনোযোগ প্রদান করেন। তিনি ভাবিলেন, কোনও প্রকারে ইহাদের অবস্থার স্বচ্ছলতা সাধন করিতে পারা যায় কি না? এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহাদের পত্নীদিগের মহিলাশ্রমে শিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। এই বিশেষ বৃত্তি লইয়া তাঁহারা আশ্রমে আসিয়া থাকিতেন ও দুই বৎসরে যেটুকু শিক্ষালাভ করিতেন তাহাতেই তাঁহাদের স্বামীর নিকট থাকিয়া বিদ্যালয়ে অথবা বাড়ীতে বালিকাগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারিতেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে বিলাতের National Indian Associationএর একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শশিপদবাবু তাহার চিঠিপত্র লেখা বিভাগের সেক্রেটারী (Corresponding Secretary) নিযুক্ত হন। ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয় আজকাল কলিকাতায় একটি অতীব সুপরিচিত বালিকাশিক্ষার কেন্দ্র। এই বিদ্যালয়ের সহিত শশিপদবাবু অতীব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এই বিদ্যালয় সর্ব্বপ্রথমে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম পল্লীর মধ্যে অতীব ক্ষুদ্রাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। শশিপদবাবু তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী স্বর্গীয়া গিরিজাকুমারী ও ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ শশিপদ বাবু বরাহনগরের স্বর্গীয় দীননাথ নন্দী মহাশয়ের পূজার দালানে এক সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শশিপদবাবু তাঁহার বিধবা ভাগিনেয়ী (জ্যেঠতুত ভগিনীর কন্যা) কুসুমকুমারীর বিবাহ দেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বরাহনগরে হিন্দু বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। শশিপদবাবু জীবনে চেষ্টা করিয়া প্রায় ৪০টি বিধবার বিবাহ দিয়াছেন। বরাহনগরের "হিন্দু বিধবাশ্রম" এখন আর নাই। বঙ্গের তদানীন্তন ছোট লাট Sir Stuart Bayley এ দেশ হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে

শশিপদবাবুকে নিজ হস্তে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর যে পত্রখানি লেখেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

The good work you have done for the education of your country-women, especially of widows needs no commendation from me. Nevertheless I should like to assure you before I leave, of the earnest sympathy I feel in your labours, of my hearty admiration for your self-sacrificing exertions and my great satisfaction of hearing of the daily multiplication of the successful results attending them."

শশিপদবাবু বরাহনগরে Female Circulating Library স্থাপন করিয়া স্ত্রীলোকদিগের—বিশেষতঃ নববধূদিগের পড়িবার পুস্তকের অভাব নিবারণ করিয়া অন্তঃপুরে জ্ঞান-চর্চ্চার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বরাহনগরে তাঁহারই প্রযত্নে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সামাজিক উন্নতি-বিধায়িনী সভা (Social Improvement Society) তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুতঃ তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে এত কাজ করিয়াছেন যে, তাহার বিশদ আলোচনা এরূপ ক্ষুদ্র জীবনীতে সম্ভবপর নহে।

প্রথম যৌবনে তিনি শিক্ষকরূপে সংসারে প্রবেশ করেন। প্রথমে কাশীপুর বিদ্যালয়ে ৮৲টাকা বেতনে তিনি শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী তাঁহার সপত্নী-পুত্রগণের সহিত চিরদিন এরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন যে, কেহ দীর্ঘকাল ধরিয়াও, এমন কি শশিপদবাবুর পরিবার মধ্যে বাস করিয়াও বুঝিতে পারিতেন না যে, তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী এই বালকদিগের বিমাতা—গর্ভধারিণী নহেন।

গত বর্ষের ১লা মে হইতে স্বয়ং মহীশূরাধিপতি শশিপদবাবুর পুত্র মিঃ আলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এসকে মহীশূর রাজ্যের স্থায়ী দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ১২২১ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতা বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটস্থ মাতামহের আলয়ে কৃষ্ণমোহনের জন্ম হয়। তিনি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারুইপুরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণবর্ত্তী নবগ্রামে তাঁহার জন্মভূমি ছিল। তিনি দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। কুলীন বলিয়া দরিদ্র হইলেও সমাজে তাঁহার মূল্য ছিল এবং তিনি বিবাহে পণ পাইয়া বেচু চাটার্জ্জী ষ্ট্রীটের রামজয় বিদ্যাভূষণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই বাস করিতে থাকেন। শ্বশুরালয়ে থাকিবার কালে তাঁহার তিনটি পুত্র ও দুইটী কন্যা হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহন, মধ্যম কৃষ্ণমোহন ও কনিষ্ঠ কালীমোহন।

রামজয় বিদ্যাভূষণও অতি সামান্য গৃহস্থ ছিলেন। তিনি সুবিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ শান্তিরাম সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। যজমানী ব্যবসায়ে সামান্য উপার্জ্জনের দ্বারা তাঁহার সংসার চলিত। রামজয় দেখিলেন, তাঁহার জামাতার পোষ্যসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাই তিনি গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে ক্ষুদ্র একখণ্ড জমি জামাতাকে দান করিয়া তথায় একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। পুত্র-কন্যা লইয়া কৃষ্ণমোহনের পিতা তথায় বাস করিতে লাগিলেন। জীবনকৃষ্ণ তথায় ভিক্ষা করিয়া এবং শ্বশুরের অর্থসাহায্যে অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ছয় বৎসর বয়সে কৃষ্ণমোহন কালীতলায় মহাপ্রাণ হেয়ার সাহেব-প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করিতেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে হেয়ার সাহেব "স্কুল সোসাইটী" নামক ইংরাজী বিদ্যালয়ে লইয়া যান। এই সময়ে কৃষ্ণমোহনের সাংসারিক অবস্থা এতাদৃশ শোচনীয় হইয়াছিল যে, কোন দিন তাঁহাদের অন্ন জুটিত, আবার কোন দিন বা তাহা জুটিত না। তাঁহার পিতামাতা অন্নের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াও কোনরূপে অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণমোহন স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তাঁহার মাতাকে ভিক্ষা করিবার অবসর দিতেন এবং নিজে মাতুলালয়ে পূজা করিয়া যাহা কিছু পাইতেন তাহাও আনিয়া সংসারে দিতেন; কিন্তু তাহাতেও কোনক্রমে তাঁহাদের সংসারের স্বচ্ছলতা হইত না। কৃষ্ণ-মোহন এক হস্তে রন্ধন করিতেন এবং অন্য হস্তে পুস্তক লইয়া তাহা পাঠ করিতেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন স্কুল সোসাইটী হইতে অবৈতনিক ছাত্ররূপে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের পরীক্ষায় কৃষ্ণমোহন সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন, কিন্তু ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতা দুঃখে কষ্টে জীবনত্যাগ করেন। হেয়ার সাহেব কৃষ্ণমোহনকে তাঁহার নিজের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। এদিকে কৃষ্ণমোহনের অগ্রজ ভুবনমোহনেরও Court of Request নামক তৎকালীন বিচারালয়ে মোকদ্দমার আরজি লিখিবার একটি চাকুরী হইল। সেই আদালত এক্ষণে "ছোট আদালত" নামে অভিহিত হইয়াছে। দুই ভ্রাতার এইরূপ চাকুরী হওয়ায় তাঁহাদের সংসার পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল অবস্থায় চলিতে লাগিল। হেয়ার সাহেবের স্কুল সোসাইটীর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া শেষে উহার নাম হয়—হেয়ার স্কুল।

কৃষ্ণমোহন যখন হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, তখন হেন্‌রি ডিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। জাতিতে ফিরিঙ্গি এবং বয়সে বিংশতিবর্ষ মাত্র হইলেও তিনি বিদ্যাবুদ্ধিগুণে কলেজের

প্রত্যেক ছাত্রের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ডিরোজিও হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার ভ্রম দেখাইয়া ও সামাজিক রীতিনীতির দোষ দেখাইয়া ছাত্রগণকে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেন। ডিরোজিওর শিক্ষা-প্রভাবে কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি ছাত্রগণ হিন্দুধর্ম্মের উপর বিশ্বাস হারান। হিন্দুসমাজে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন চলিতে লাগিল। ছেলেদের অভিভাবকেরা হেয়ার সাহেবকে বলিলেন যে, যদি ডিরোজিওকে হিন্দুকলেজ হইতে বহিষ্কৃত করা না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আর পুত্রদিগকে উক্ত কলেজে পাঠাইবেন না। তখন বাধ্য হইয়া ডিরোজিও কার্য্য পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রভাব হিন্দু যুবকগণের মন হইতে গেল না। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যুবকেরা Academic Association নামে এক সভা সংস্থাপন করিয়া হিন্দু সমাজের কুসংস্কাররাশি-উৎপাটনে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যে বসিয়া গোহাড়, গোমাংস নিক্ষেপ সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। একদিন কৃষ্ণমোহনের বাড়ীর নিকটে ইঁহারা এক ব্রাহ্মণের বাটীতে গোহাড ও গোমাংস নিক্ষেপ করেন। ব্রাহ্মণেরা আসিয়া কৃষ্ণমোহনের অগ্রজের নিকট কৃষ্ণমোহনের নামে অভিযোগ করেন। কৃষ্ণমোহন বাটীতে আসিলে অগ্রজ ভুবনমোহন তাঁহাকে বলেন, 'তোমার জ্বালায় দেখিতেছি, বাড়ী ছাড়িতে হইবে, হয় তুমি বাড়ী ছাড়, না হয় আমি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।" কৃষ্ণমোহন জ্যেষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অবনতমস্তকে বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ডফ সাহেব সুযোগ বুকিয়া কৃষ্ণমোহনকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহনও হিন্দু সমাজ ছাড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হিন্দু সমাজের সকলে হেয়ার সাহেবকে বলিলেন, "কৃষ্ণমোহনকে তোমার স্কুল হইতে না তাড়াইলে আমরা

তোমার স্কুলে আর ছেলে পাঠাইব না।” হেয়ার সাহেব অগত্যা কৃষ্ণমোহনকে হেয়ার স্কুল হইতে বরখাস্ত করিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে ডফ সাহেবের ভবনে ডফ সাহেবের পৌরোহিত্যে কৃষ্ণমোহন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়ে London Missionary Societyর তত্ত্বাবধানে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। কৃষ্ণমোহন উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

কৃষ্ণমোহনের বয়স যখন ১৫।১৬ বৎসর তখন হাবড়া-নিবাসী রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা বিন্দুবাসিনীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। পতিব্রতা স্ত্রী পতিকে ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে থাকিতে কোন মতেই রাজি হইলেন না। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনিও খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বামীর সহিত একত্র বাস করিতে থাকেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের Reformer পত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া Inquirer নামক একখানি কাগজ বাহির করেন। Inquirer পত্রে হিন্দুসমাজের সংস্কার সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালা ভাষার দুর্গতি দেখিয়া এই সময়ে কৃষ্ণমোহন “সুধাংশু” নামে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্রও প্রকাশ করেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকের পদে উন্নীত হন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্য হেদুয়ারের পশ্চিমে বেথুন কলেজের দক্ষিণে একটি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হয়। অদ্যাবধি সেই গির্জ্জাটি “কৃষ্ণ বাঁড়ুজ্যের গির্জ্জা” নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। এই গির্জ্জাতেই তিনি আচার্য্যের আসনে উপবেশন করিয়া উপদেশ দিতেন। এই গির্জ্জায় ১৮৩৭—১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মযাজকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কৃষ্ণমোহন আপন চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে বহু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আরবী, পার্শী, উর্দ্দু, হিন্দী, বাঙ্গালা, ইংরাজী, লাটীন, গ্রীক্, হিব্রু, উড়িয়া, তামিল, গুজরাটী—এই কয়টি ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীমোহনও খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহন প্রায় প্রতি বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, হিন্দী, তামিল ও উড়িয়া ভাষার পরীক্ষক হইতেন। কৃষ্ণমোহনের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রচলন হয়।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন "সর্ব্বার্থসংগ্রহ" নামক মহাকোষ (Encyclopaedia Begaliansis) প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহা ত্রয়োদশ খণ্ডে বিভক্ত এবং ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার একটি অমূল্য সম্পদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে Bethune Society প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষ্ণমোহন উহার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। Calcutta Review পত্রে তাঁহার কয়েকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রধান অনুবাদকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি শিবপুর বিশপস্ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ায় সে পদ পরিত্যাগ করেন। উহা ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

বিশপস্ কলেজের অধ্যাপক হইয়াও কৃষ্ণমোহনের শিক্ষানুরাগ কমিল না কিংবা তাঁহার লেখনী বিরাম লাভ করিল না। তিনি ১৮৬১—৬২ খ্রীষ্টাব্দে ষড়দর্শন বিষয়ে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই লিখিয়া উভয় ভাষারই পুষ্টিসাধন করেন। ইহা ভিন্ন তিনি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শারীরক ভাষ্য, নারদ-পঞ্চরাত্র, ব্রহ্মসূত্র, মার্কণ্ডের পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত ও ইংরাজী

সটীক অনুবাদ প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "ঋগ্বেদসংহিতা" টীকা-সহ প্রকাশ করিয়া বেদপাঠকগণের মহাকল্যাণ সাধন করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার "আর্য্যশাস্ত্রের সাক্ষ্য" নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহনের পত্নী বিন্দুবাসিনী চারিটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম কমলমণি, মধ্যমার নাম দৈবকী, তৃতীযার নাম মনোমোহিনী ও চতুর্থার নাম মিলি। কমলমণির রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার মধ্যমা কন্যা দৈবকীর সহিত সেল সাহেবের, মনোমোহিনীর সহিত হুইলার সাহেবের এবং মিলির সহিত ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বিবাহ হয তাঁহার কন্যাগুলি সকলেই সুশিক্ষিতা।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিবপুর বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যাপকতা করিযা স্ত্রীবিযোগের পর কৃষ্ণমোহন চাকুরী পরিত্যাগ করেন। বাঙ্গালীর মধ্যে যত লোক খ্রীষ্টান হইযাছেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণমোহনই সর্ব্বপ্রথমে "রেভারেণ্ড" বা আচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "ফেলো" নির্ব্বাচিত হন এবং তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষক হন। এতদ্ভিন্ন তিনি Faculty of Artsএর সভাপতি, কলিকাতা বিশপের অবৈতনিক চ্যাপলেন, এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালী খ্রীষ্টানের মুখ উজ্জ্বল করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে Doctor of Law, বা D. L. উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে C. I E. উপাধি প্রদান করেন। ঐ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি British Indian Associationএরও

সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটীর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার ন্যায় স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক লোকের পক্ষে কর্তৃপক্ষের মন যোগাইয়া কার্য্য করা অসম্ভব হইত ; তাই তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটীর সংশ্রব পরিত্যাগ করেন।

ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও তিনি তাঁহার জননী ও ভ্রাতৃগণকে অর্থ-সাহায্য করিতেন। হিন্দুসমাজ প্রথমে তাঁহার উপর রুষ্ট হইলেও শেষে তাঁহার গুণরাশি-দর্শনে তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। তিনি দীন-দুঃখীকে দান করিতে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। স্বদেশের উন্নতিকর যাবতীয় অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে ৭২ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কলিকাতা টাউন হলের দ্বিতলে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র আছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী

বঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেনের পর শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের মেরুদণ্ড ছিলেন। কলিকাতা সহরের প্রায় বিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে সুন্দরবনের উত্তর প্রান্তে মজিলপুর গ্রাম শিবনাথের জন্মভূমি। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থ অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময় যখন রাজা মানসিংহ যশোহর আক্রমণ করেন, তখন চন্দ্রকেতু দত্ত নামক একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভদ্রলোক সপরিবারে যশোহর অঞ্চল হইতে পলায়ন করিয়া মজিলপুর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার যজ্ঞ-পুরোহিত ও কুলগুরু শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা নামক এক ব্রাহ্মণও আসিয়াছিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতাই শিবনাথের পূর্ব্ব-পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা দাক্ষিণাত্যের বৈদিকশ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা অথবা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া থাকিবেন। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, যাজপুর হইতেই শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা হইতে শিবনাথ অধস্তন নবম পুরুষ। এই বংশের ব্রাহ্মণগণ মজিলপুর গ্রামের মধ্যভাগ ছাইয়া ফেলিয়াছেন। ইঁহাদের গোত্র বাৎস্য এবং ইঁহারা চিরদারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়া আবহমানকাল ধরিয়া কেবল যজন-যাজন করিয়া আসিতেছেন। শিবনাথের পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বপ্রথম ইংরাজের অধীনে পণ্ডিতী গ্রহণ করেন, তৎপূর্ব্বে এই বংশের কেহ চাকুরী করেন নাই।

শিবনাথের জ্ঞাতি-কুটুম্ব সকলে মজিলপুর গ্রামে ১০।১২টী

টোল বা চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। শিবনাথের প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কারেরও একটী চতুষ্পাঠী ছিল। রামজয় ৹৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। যাঁহারা হিন্দুর আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে মানিয়া, ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম অবলম্বন করিয়া, অখাদ্য-কুখাদ্য বর্জ্জন করিয়া সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন করিতেন, তাঁহাদের পক্ষে এই প্রকার দীর্ঘজীবী হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমাদের দেশের প্রাচীন ও প্রাচীনারা এই প্রকার হিন্দুশাস্ত্র-বিহিত জীবনযাপন করিতেন বলিয়া তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন, আর সেই সমস্তের অভাবে আজ ভারতবাসীর সাধারণ আয়ু ২০ বৎসর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। বিদ্যাসাগর মহাশয় মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাঠ উঠাইয়া দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে স্বরচিত উপক্রমণিকা পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া সংস্কৃত-শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ওলাউঠা রোগে শিবনাথের পিতামহ ও পিতামহী এবং প্রপিতা-মহী মৃত্যুমুখে পতিত হন। শিবনাথের প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার উপার্জ্জনেই সংসার চলিত। শিবনাথের মাতামহের নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। শিবনাথের বয়স যখন ৯।১০ বৎসর মাত্র, তখন হরচন্দ্র উরুস্তম্ভরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শিবনাথেয় বড় মাতুল। তাঁহার এক বাতিক ছিল এই যে, তিনি সর্ব্বদা হুঁকা কলিকা হাতে করিয়া বেড়াইতেন। ১২৫৩ সালের ১৯শে মাঘ ইংরাজী ১৮৪৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী রবিবার চিংড়িপোতায় মাতুলালয়ে শিবনাথের জন্ম হয়। ৫ বৎসর বয়স হইলেই মা তাঁহাকে গ্রামের একটী পাঠশালায় পড়িতে পাঠান। তাঁহার মা নিজে লেখাপড়া জানিতেন এবং নিজে পুত্রকে

পড়াইতেন বলিয়া পাঠশালার অন্যান্য বালকদের অপেক্ষা শিবনাথ অল্প দিনে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। শিবনাথের পিতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে শিবনাথের জননী তাঁহাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেন। পিতা সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন বলিয়া শুধু গ্রীষ্মাবকাশে ও পূজার ছুটীর সময়ে বাড়ী আসিতেন। কাজেই শিবনাথের বাল্যশিক্ষার দিকে তাঁহার জননীকেই দৃষ্টি দিতে হইত। তাহার মায়ের বয়স যখন ঊনবিংশতিবর্ষ মাত্র তখন শিবনাথের জন্ম হয়। শিবনাথের বয়স যখন ছয় বৎসর তখন তাঁহার একটী ভগিনী হয়, সেই ভগিনীর নাম রাখা হয় উন্মাদিনী। কুসংসর্গে মিশিবার ভয়ে মাতা শিবনাথকে প্রতিবেশী ছেলেদের সহিত মিশিতে দিতেন না বলিয়া দুই ভাই-বোন বাড়ীতে বসিয়া খেলা করিত। শিবনাথের জননী অতি নিষ্ঠাবতী হিন্দুমহিলা ছিলেন। পুত্রকন্যা রোগে পড়িলে তিনি তাঁহাদের আরোগ্যের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। তিনি নিত্য শিবপূজা করিতেন। তাঁহার প্রপিতামহও প্রতিদিন তপ, জপ, পূজা, সন্ধ্যা, আহ্নিক করিতেন। প্রতিদিন পিতৃপুরুষের তর্পণ করা তাঁহার নিত্যক্রিয়া ছিল। নবম বৎসরে উপনীত হইলে শিবনাথের উপনয়ন সংস্কার হয়।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে শিবনাথ পিতার সহিত প্রথম কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার পিতা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও এবং সংস্কৃত কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও মাসিক ২৫৲ টাকার অধিক বৃত্তি পাইতেন না। এই কারণে তিনি তাঁহাকে ইংরাজী শিখিবার জন্য হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন; কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজী না শিখিলে হাজার সংস্কৃতশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও মোটা বেতন পাইবার কোন আশা নাই। কিন্তু সেই সময়ে

বিদ্যাসাগরমহাশয়ও সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শিখিবার প্রবর্ত্তন করায় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের বাসায় আসিয়া শিবনাথকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য বলায় তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজেই ভর্ত্তি করা হইল। শিবনাথের মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। শিবনাথ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জেলিয়াপাড়ায় তাঁহাদের বাসায় যখন ছিলেন, তখন সিপাহীবিদ্রোহ হয়। তখন পটলডাঙ্গা হইতে সংস্কৃত কলেজ উঠিয়া গিয়া বহুবাজার ষ্ট্রীটের তিনটি বাড়ীতে থাকে। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষক-পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্থকিয়া ষ্ট্রীটের রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে যেদিন প্রথম বিধবা-বিবাহ হয়, সেদিন বালক শিবনাথ তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের পর কাউয়েল সাহেব সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। এই জেলিয়াপাড়া বাসাতে যখন শিবনাথ থাকিতেন তখন তাঁহার ভগিনী উন্মাদিনী ও প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া বার বৎসরের বালক শিবনাথ পদব্রজে কলিকাতা হইতে ১৮ মাইল পথ হাঁটিয়া মজিলপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জেলিয়াপাড়ার বাসায় থাকিতে শিবনাথের বয়ঃক্রম যখন ১২।১৩ বৎসর তখন তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। রাজপুর গ্রামের নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ীর সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। প্রসন্নময়ীর বয়স তখন দশ বৎসরের অধিক হইবে না। দাক্ষিণাত্যের বৈদিকদিগের কুলপ্রথানুসারে প্রসন্নময়ীর বয়ঃক্রম একমাস ও শিবনাথের বয়ঃক্রম যখন দুই বৎসর তখন তাঁহার সহিত শিবনাথের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়।

ইহার কিছুদিন পরে মাতলায় রেলওয়ে খুলে। "সোমপ্রকাশ" যন্ত্র কলিকাতা হইতে চিংড়িপোতা গ্রামে তাঁহার মাতুলের বাসভবনে

উঠিয়া যায়। ফলে শিবনাথদের বাসা উঠিয়া যায়। তাঁহার পিতা শিবনাথকে সুকিয়া ষ্ট্রীট বাদুড় বাগানে এক আত্মীয়ের বাসাতে রাখিয়া আসেন। তথায় কিছুদিন বাস করিবার পর পিতা তাঁহাকে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে রাখিয়া আসেন। তাঁহারা শিবনাথকে অতি আপনার লোক মনে করিয়া বিশেষ সমাদর করিতেন। তাঁহারা এবং তাঁহাদের বাটীস্থ সকলে, এমন কি, চাকর-বাকরেরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে "ভট্টি ভট্টি" বলিয়া ডাকিত। ভবানীপুরে ইহাদের বাটীর নিকট ব্রাহ্মসমাজ থাকাতে শিবনাথ প্রায়ই তথায় যাইতেন। ১৮৬২ সালে কেশবচন্দ্র সেন তথায় বক্তৃতা দিতেন। তদ্ভিন্ন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশী তথায় ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উপদেশ দিতেন। তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজের দিকে শিবনাথের মন একটু আকৃষ্ট হয় তিনি তখনও ব্রাহ্ম-সমাজে মিশেন নাই বটে, কিন্তু উমেশচন্দ্র দত্ত, কাশীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু-প্রমুখ ব্রাহ্ম যুবকদিগকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। এই সময়ে প্যারীচরণ সরকার মহাশয় এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ও সুরাপান-নিবারণী সভার সভাপতি ছিলেন। শিবনাথ এডুকেশন গেজেটে তখন কবিতা লিখিতেন। প্যারীচরণ তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসরও ছিলেন। প্যারীচরণ সরকারের সংস্পর্শে আসিয়া সুরাপানের উপর শিবনাথের তীব্র বিদ্বেষ জন্মিল। তদবধি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শিবনাথ সুরাপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

তৎপর ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ সালে শিবনাথকে তাঁহার পিতা শিবনাথের শ্বশুরকুলের সহিত ঝগড়া করিয়া বর্দ্ধমান জেলার দেহুর গ্রামের অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিরাজমোহিনীর সহিত বিবাহ দেন। শিবনাথ এই বিবাহে নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। একটা নিরপরাধা বালিকাকে অন্যায়রূপে গুরুতর সাজা দেওয়া হইল এবং শিবনাথ

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই অন্যায় কার্য্যের প্রধান যন্ত্র হইলেন, ইহা ভাবিয়া তিনি লজ্জা ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তবে তিনি মনকে এই ভাবিয়া প্রবোধ দিলেন যে, যখন রামচন্দ্র পিতৃআজ্ঞা-পালনের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বনে গিয়াছিলেন, তখন তিনি না হয় পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন। তিনি মনস্তাপে তাপিত হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন এবং এই সময় হইতে ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনার অভ্যাস তাঁহার জন্য জন্মে। তখন হইতে মনে শান্তি পাইবার জন্য ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করিতেন ; কিন্তু পাছে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় কিম্বা চিনিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি প্রার্থনা আরম্ভের পরে ও প্রার্থনা শেষ হইবার পূর্ব্বে তথা হইতে চলিয়া আসিতেন। তাঁহার বন্ধু ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে কেশববাবুর নিকট লইয়া যাইতে চাহিলেও তিনি যাইতেন না, তাঁহার কেমন লজ্জা করিত। এই সময়ে শিবনাথ তাঁহার কোন ব্রাহ্ম বন্ধুর বাসায় থাকিতে আরম্ভ করেন। শিবনাথের পিতা এই সংবাদ শুনিয়া কলিকাতায় আসেন এবং শিবনাথকে অত্যন্ত তিরস্কার করেন। শিবনাথ পিতার মুখের উপর বলেন যে, তিনি কোন মতে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় উপস্থিতি ত্যাগ করিতে পারিবেন না। শিবনাথের এই কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া প্রচার করিলেন, শিবনাথ মারা গিয়াছে, শিবনাথের জননী এই কথা শুনিয়া বিস্তর কাঁদিয়াছিলেন।

পিতার নিকট, আত্মীয়-স্বজনের নিকট পাপী বলিয়া পরিগণিত হইলেও শিবনাথ মনে করিতে লাগিলেন, ভগবানের নিকট তিনি নিরপরাধ। তিনি কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজের বিশ্বাস-অনুসারে চলিতে লাগিলেন। পূজাবকাশে তিনি বাড়ীতে গেলেন, তাঁহার মাতা তাঁহাকে ঠাকুর পূজা করিতে বলিলেন, কিন্তু শিবনাথ দৃঢ়কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন, ধর্ম্মের নামে তিনি প্রবঞ্চনা করিতে

পারিবেন না। তাঁহার পিতা তাঁহাকে লাঠি লইয়া মারিতে আসিলেন, তত্রাচ শিবনাথ ঠাকুর পূজা করিতে স্বীকৃত হইলেন না ; তাহার ফলে গ্রামবাসী জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের বাড়ীর দ্বার তাঁহার পক্ষে রুদ্ধ হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের মূর্ত্তিপূজারও শেষ হইল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ ভবানীপুরে চৌধুরীমহাশয়দের বাটী হইতে ঐ স্থানের একটি ভদ্র পরিবারের অনুরোধে তাঁহাদের সহিত কলিকাতা শাঁখারিটোলার এক বাড়ীতে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিধবা বিবাহ করেন। শিবনাথ শাঁখারিটোলা ছাড়িয়া যোগেন্দ্রের সহিত বাস করিবার জন্য যান। শাঁখারিটোলার বাড়ীতে একটি বালিকা থাকিত। শ্বশুর-বাড়ীতে তাহার উপর ভাল ব্যবহার করিত না, ইহার ফলে সেই বালিকাটি সর্ব্বদাই নিয়মাণ অবস্থায় থাকিত। তাহা দেখিয়া শিবনাথের বুক এমন ভাবে ফাটিয়া যাইত যে, তিনি বাল্যবিবাহের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। বাল্যবিবাহের নাম শুনিলেই তিনি শিহরিয়া উঠিতেন। যোগেন্দ্রনাথ এই বিধবা-বিবাহ করায় তাহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। শিবনাথ যোগেন্দ্রের বিবাহের ঘটক ছিলেন। যোগেন্দ্র, শিবনাথ ও ঈশানের স্কলারসিপে যোগেন্দ্রের সংসার চলিতে লাগিল

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। এই সময় শিবনাথ মাংসাহার পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর শিবনাথ এফ-এ পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটীর প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি ৩২৲, ইংরাজী ও সংস্কৃতে ইউনিভার্সিটীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ডফ স্কলারসিপ ১৫৲ ও সংস্কৃত কলেজের প্রথম স্কলার-শিপ ১২৲—সর্ব্বসমেত ৫৯৲ টাকা বৃত্তি পান। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে—শিবনাথ ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা শোভাবাজার রাজ-বাড়ীর নাটমন্দিরে সংস্কৃত 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় করেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই ভাদ্র যেদিন ব্রাহ্মমন্দির খোলা হয়, সেদিন অপরাপর কতিপয় যুবকের সহিত আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের নিকট শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের দীক্ষা লইয়া প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। এই সময়ে শিবনাথ একেবারে পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইলেন। শিবনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, ১৮৬৫ সাল হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। তাঁহার জ্ঞাতি-দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নই এই আকর্ষণের মূল ছিলেন। হেমচন্দ্র প্রতিনিয়ত শিবনাথের নিকট ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের গুণ কীর্ত্তন করিতেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণের পর উপবীত-ত্যাগের সঙ্কল্প করিলে তাঁহার পিতা আসিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে ধরিয়া লইয়া গেলেন এবং প্রায় একমাস কাল তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। তিনি পাগল হইয়াছেন বলিয়া চারিদিকে জনরব রাষ্ট্র হইল। এমন কি, ৩।৪ ক্রোশ দূর হইতে এই অদ্ভুত লোকটিকে দেখিবার জন্য লোক আসিতে লাগিল। তাহারা আসিয়া শিবনাথের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া তাহার প্রত্যেক গতিবিধি পর্য্যাবেক্ষণ করিত। এমনই ভাবে শিবনাথ একদিন বসিয়া আছেন, চাষার মেয়েরা সকলে ঘরের প্রাঙ্গণে তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে শিবনাথ বলিলেন, "মা একটু তেল দেও, আমি স্নান করিয়া আসি।" শিবনাথকে কথা বলিতে দেখিয়া চাষার মেয়েরা অবাক্ হইয়া তাঁহার মাকে বলিল, "তা হ'লে কথা কয়।" চাষার মেয়েদের কথা শুনিয়া শিবনাথের হাসি আসিত। আর একদিন শিবনাথ ঘরের দাওয়ায় বসিয়া মুড়ি খাইতেছেন, এমন সময় পাড়ার একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল, "ওমা, এ যে মুড়ি খায়, তবে বলে যে, এ আমাদের মধ্যে নেই।" এইভাবে মাসাধিক কাল আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া শিবনাথের পিতা যখন দেখিলেন যে, পুত্রের সঙ্কল্প কিছুতেই দূর হইবার নহে, তখন

শিবনাথকে চিরজীবনের জন্য বর্জ্জন করিলেন এবং আবশ্যক জিনিষপত্র ও খরচা-পত্রাদি দিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি ১৮।১৯ বৎসর কাল তিনি আর শিবনাথের মুখদর্শন করেন নাই। পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া শিবনাথ অকূল সমুদ্রে পড়িলেন বটে, কিন্তু মোটা স্কলারশিপ থাকায় তাঁহার বিশেষ কোন কষ্ট হইল না। তিনি আসিয়া পটলডাঙ্গা মিরজাফরস্ লেনে শ্রীযুত হরগোপাল সরকারের সহিত একত্র বাসা করিলেন। পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভগদ্বিশ্বাসী শিবনাথ লিখিলেন—

"ভাসায়ে জীবন-তরী বিপত্তির সাগরে,
যাই দেব ! দেখ দেখ রক্ষা কর আমারে ;
মোর পক্ষ ছিল যার
বিপক্ষ হইল তারা,
ঘেরিল সকল দিক অপবাদ-আঁধারে
বহিল প্রবল ঝড় মস্তকের উপরে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কেশববাবু বিলাতে গেলেন, তাহাতে শিবনাথের মনে ভারী কষ্ট হয়। শিবনাথকে কেশব বড় ভালবাসিতেন। কেশব বাবু শিবনাথের সহিত অনেক সময় ঠাট্টা-তামাসাও করিতেন। একদিন বড়লাটের বাড়ীতে সান্ধ্য সমিতিতে গিয়া কেশব রাত্রি ৯ টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবনাথ বলিলেন, আপনি ৮ টার সময় আসিবেন বলিয়া গেলেন, অথচ রাত্রি ৯ টায় আসিলেন। কেশব বলিলেন, কি করি ? কত বড় বড় লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন, কেহ ছাড়ে না। শিবনাথ বলিলেন, আচ্ছা, বড় বড় লোকদের ত বড়লাট কত উপাধি দেন, আপনাকে ত কোন উপাধি দেন না। কেশব হাসিয়া বলিলেন কেন, আমি যে K. C. S. I (অর্থাৎ আমি কেশবচন্দ্র সেন)।

শিবনাথ কেশব-বিচ্ছেদে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। ঈশ্বরের প্রতি কেমন করিয়া সমস্ত বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে হয়, শিবনাথ কেশবের নিকটই তাহা শিখিয়াছিলেন। কেশবের বিচ্ছেদ-জ্বালা জুড়াইবার জন্য মজিলপুর যাইতেন। তাঁহার পিতা যে সময় বাড়ীতে থাকিতেন না, সেই সময় চুপি চুপি গিয়া কেশব মাতৃদর্শন করিয়া আসিতেন পিতা যদি কোনরূপে সংবাদ পাইতেন যে, শিবনাথ—তাহার বিতাড়িত পুত্র শিবনাথ—স্বধর্ম্মত্যাগী শিবনাথ বাড়ীতে আসিয়াছেন, অমনি তিনি লাঠি লইয়া তাঁহাকে তাড়া করিয়া আসিতেন। কেশবের স্নেহময়ী জননী খিড়কী দ্বার দিয়া পুত্রকে বাহির করিয়া দিতেন। শিবনাথকে মারিবার জন্য তাঁহার পিতা টাকা দিয়া গুণ্ডা ও লাঠিয়াল পর্য্যন্ত ভাড় করিয়াছিলেন। শেষে গ্রামের লোকে শিবনাথের পিতার ব্যবহারে একজোট হইয়া তাঁহাকে বলিল, "তুমি না হয় তোমার পুত্রকে বাড়ীতে আসিতে না দিতে পার, কিন্তু তাহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইবার তুমি কে? তুমি ত গ্রামের মালিক নও।" গ্রামবাসীদের এই কথা শুনিয়া শিবনাথের পিতা আর তাহাকে মারিতেন না, শিবনাথ অবাধে বাড়ীতে যাইয়া মাতৃদর্শন করিতেন। তিনি যতক্ষণ গৃহে থাকিতেন, ততক্ষণ তাঁহার পিতা সেদিকে আসিতেন না।

এই সময়ে অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ ও তাহার ভ্রাতৃগণ মিলিয়া উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের মধ্যে "আনন্দবাদী দল" নামে একটি দল গঠন করেন। শিবনাথকে তাঁহারা সেই দলে মিশিবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করেন। কেন ব্রাহ্মেরা আনন্দবাদী দল গঠন করেন? তাহার কারণ এই, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কেশববাবু Jesus Christ, Asia and Europe নামক সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার ফলে বড় লাট লর্ড লরেন্সের সহিত তাঁহার ভাব হয়. এবং ব্রাহ্মদলের মধ্যে যীশু খৃষ্টের প্রভাব, যীশুখৃষ্টের ধ্যান ও বাইবেলের কথা প্রভৃতি স্থান পায়।

তখন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি কয়েক জন ব্রাহ্মকে লইয়া "আনন্দবাদী দল" গঠন করেন এবং ব্রাহ্মসমাজে বৈষ্ণব সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করেন। শেষে অমৃতবাজারের দল আর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যোগ দিতেন না। শিশিরবাবু যশোহরের লোকদের লইয়া আনন্দবাদী দল গঠন করিয়া সংকীর্ত্তন করিতেন। শিশিরবাবুর দল এই ভাবে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৮৭০ সালে শিবনাথের পত্নী প্রসন্নময়ীর গর্ভে তাঁহার দ্বিতীয় কন্যা তরঙ্গিণীর জন্ম হয়। গৃহ হইতে বিতাড়িত হইবার পর শিবনাথ প্রসন্নময়ীকে লইয়া কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। কেশববাবু কয়েক মাস পরে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া Indian Reform Association নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার অধীনে Temperance, Education, Cheap literature, Technical education প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপিত হয়। শিবনাথ সেই সভার সহিত যোগদান করিয়া সুরাপানের বিরুদ্ধে কাজ করিতে লাগিলেন। শিবনাথ "সুরা না গরল" নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিলেন, তাহা ছাড়া "সুলভ সমাচার" নামক এক পয়সা মূল্যের যে একখানি সংবাদপত্র বাহির হইত তাহাতেও তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কেশববাবু এই সময়ে Society of Theistic Friendকে পুনরুজ্জীবিত করেন। শিবনাথ কেশবের অনুরোধে সেই সভায় ইংরাজী ভাষায় কয়েকটি বক্তৃতা করেন। অতঃপর কেশবচন্দ্র বালিকাগণের বিবাহের কাল নির্দ্দেশ করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে চেষ্টা করেন। তদনুসারে ১৮৭২ সালের তিন আইনে ১৪ বৎসর বালিকার সর্ব্বনিম্ন বয়স বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। শিবনাথ এই আইন প্রণয়নে কেশব-চন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন; এই সময়ে কেশবচন্দ্র ভারতাশ্রম

প্রতিষ্ঠা করেন এবং কলুটোলার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া শিবনাথ প্রভৃতির সঙ্গে প্রথমে বেলঘরিয়া, পরে কাঁকুড়গাছির এক বাগানে অবস্থান করেন। তখন সকলে স্ব স্ব ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া একান্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় বাস করিতেন। শিবনাথ কেশববাবুর স্ত্রীকে ইংরাজী পড়াইতেন। শিবনাথ কলেজের পাঠ শেষ করিয়া ওকালতী করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, সেইজন্য তিনি তিন বৎসর ল লেকচার শুনিয়া শেষ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বি-এ পাশ করিবার পর শিবনাথের মনে আর এক বাসনার উদয় হইল; তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন—এই আশায় ভারতাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ এম্-এ পাশ করিয়া বাহির হইয়াই নব-প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন এবং সপরিবারে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত কিছু অর্থ দেওয়া হইত। কিন্তু কেশবের সহিত শিবনাথের বেশী দিন সম্প্রীতি থাকিল না। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি তখন স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। শিবনাথ তাহাতে যোগ দিলেন এবং পর্দ্দার বাহিরে স্ত্রীলোকদের বসাইয়া বহুবাজার ষ্ট্রীটে অন্নদাচরণ খাস্তগিরের বাটীতে নব্য সম্প্রদায়ের যে উপাসনা চলিত তাহাতে উপাসনা করিতে লাগিলেন। কেশব ইহাতে শিবনাথের উপর রুষ্ট হইলেন। কেশববাবুর সহিত শিবনাথের মনোমালিন্যের আর একটি কারণ এই ছিল যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার আদেশকে "ভগবৎ আদেশ" বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। শিবনাথ দেখিলেন, ইহাতে চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট হয়, তাই শিবনাথ কেশবচন্দ্রের আদেশ পালন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অধিকন্তু এই বিষয় লইয়া কেশবের সহিত তর্ক-বিতর্ক করায় কেশব মনে মনে শিবনাথের উপর আরও রুষ্ট হইলেন। কেশবের আদেশ যাঁহারা ঈশ্বরাদেশ বলিয়া না মানিতেন, তাঁহারাই কেশবের বিরাগভাজন হইতেন।

কেশব বাবুর সহিত শিবনাথের মনোমালিন্যের তৃতীয় কারণ এই যে, কেশব বাবু ইংলণ্ড হইতে আসিয়া ব্রাহ্মমন্দিরের উপাসকদিগকে ডাকিয়া প্রথম প্রথম পরামর্শ করিতেন, কিন্তু উপাসকেরা স্বাধীন মতামত প্রকাশ করায় কেশবের তাহা সহ্য হইত না এবং তিনি আর উপাসকগণকে ডাকিতেন না। শিবনাথ ও অন্যান্য কয়েকজন উপাসক কেশবের এইরূপ নিয়মবিরুদ্ধ আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৮৭৩ সালে শিবনাথের মাতুল 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পীড়িত হইয়া পড়েন। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকতা হইতে বিদায় লইয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য যান। যাইবার সময় শিবনাথকে ডাকিয়া তাঁহার 'সোমপ্রকাশ', গ্রামস্থ সংস্কৃত ইংরাজী স্কুল, তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি ও তাঁহার পরিবার-পরিজনের দেখিবার ভার শিবনাথের উপর দিয়া যান। মাতুলের অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া শিবনাথকে বাধ্য হইয়া কেশব-প্রতিষ্ঠিত মহিলা স্কুলের শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। কেশববাবু ইহাতেও শিবনাথের প্রতি মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে শিবনাথের দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজ মোহিনীর পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী সকলেই মারা যাওয়ায় শিবনাথ সেই নিরাশ্রয়া পত্নীকে লইয়া আসিলেন এবং বিরাজমোহিনীকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু বিরাজমোহিনী তাহাতে রাজী না হইয়া মহিলা বিদ্যালয়ে পড়িতে লাগিলেন। শিবনাথের অন্যতম পত্নী প্রসন্নময়ীর গর্ভে হেমলতা, তরঙ্গিণী ও প্রিয়নাথ জন্মগ্রহণ করায় শিবনাথ প্রসন্নময়ীকে লইয়া এতদিন গৃহস্থালী করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে বিরাজমোহিনী ও প্রসন্নময়ী এই উভয়ের হাত এড়াইবার জন্য শিবনাথ রাত্রিতে হিন্দু কলেজের বারান্দায় দপ্তরীদের টেবিলে বই মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িয়া থাকিতেন। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া উভয়েই কাঁদিতে

লাগিলেন। তখন শিবনাথ অনন্যোপায় হইয়া হরিনাভিতে গিয়া মাতুলের 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকতা, স্কুলের সম্পাদকতা ও হেড মাষ্টারী, তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধায়কত্ব ও তাঁহার পরিবার-পরিজনবর্গের রক্ষকত্ব এবং অভিভাবকতা গ্রহণ করিলেন। প্রসন্নময়ীও হরিনাভিতে গেলেন, আর বিরাজমোহিনী আশ্রমে রহিলেন। প্রতি শনিবার শিবনাথ কলিকাতায় আসিয়া বিরাজমোহিনীর সহিত স্বামীস্ত্রী ভাবে যাপন করিতেন। ১৮৭' সালের ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের দিন হরিনাভিতে শিবনাথের তৃতীয় কন্যা সুহাসিনীর জন্ম হয়। হরিনাভিতে স্কুলের হেড মাষ্টার-স্বরূপ কর্ম্ম করিয়া শিবনাথ মাসিক একশত টাকা বেতন পাইতেন। হরিনাভিতে যে একটি মৃতপ্রায় ব্রাহ্মসমাজ ছিল, শিবনাথ সেই সমাজটিকেও পুনরুজ্জীবিত করেন। কিন্তু হরিনাভির ন্যায় ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে বাস করায় শিবনাথের ম্যালেরিয়া ধরায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবনাথকে ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলের হেডমাষ্টার করিয়া আনা হয়। উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শিবনাথের স্থলে হরিনাভি স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া গমন করেন। বিরাজমোহিনী উমেশচন্দ্রের পরিবারবর্গের সহিত হরিনাভিতে যাইলেন এবং তথায় বাস করিতে লাগিলেন। প্রতি শনিবার হরিনাভিতে গিয়া শিবনাথ 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকতা ও বিরাজমোহিনীর সহিত স্বামীস্ত্রীর ন্যায় বাস করিতেন। শেষে 'সোমপ্রকাশ' কাগজ ও ছাপাখানা শিবনাথ ভবানীপুরে তুলিয়া আনেন। ভবানীপুরে শিবনাথ একটি ব্রাহ্মসমাজও স্থাপন করেন।

১৮৭২ সালে উন্নতিশীলদলের সহিত কেশববাবুর আবার মনোমালিন্য হইল। কেশববাবু মহিলাগণকে পর্দ্দার আড়ালে রাখিবার বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু অন্নদাচরণ খাস্তগীর, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি আপনাপন পত্নী ও কন্যাগণকে আনিয়া একেবারে সাধারণ দর্শকদের মধ্যে বসাইতে লাগিলেন। ফলে কেশববাবুর সহিত উন্নতিশীলদলের

বিরোধ হওয়ায় তাঁহারা "সমদর্শী" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। শিবনাথকে সেই পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত করা হইল। ফলে সাধারণ্যে প্রচারিত হইল যে, শিবনাথ কেশবচন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া একটা নূতন দল গঠন করিয়াছেন।

ভবানীপুর-বাসকালে প্রসন্নময়ীর গর্ভে শিবনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সরোজিনীর জন্ম হয়। এই সময়ে শিবনাথ দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণকে দেখিতে যান। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন এবং রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া শিবনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধর্ম্ম এক, রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। শিবনাথের সহিত একদিন এক খৃষ্টান প্রচারক রামকৃষ্ণকে দেখিতে গিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলেন, "এই আমার যীশুখৃষ্টের চরণে প্রণাম।" রামকৃষ্ণ শিবনাথকে এতদূর ভালবাসিতেন যে, শিবনাথ কোন দিন তাঁহার নিকট না যাইতে পারিলে তিনি নিজেই শিবনাথের বাসায় আসিতেন।

ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন স্কুল হইতে শিবনাথকে হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত ও ট্রানস্লেসন-মাষ্টার-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আনা হইল ১৮৭৬ সালে শিবনাথ হেয়ার স্কুলে আসেন। শিবনাথ ভবানীপুর হইতে কলিকাতায় আসিলে "সমদর্শী" কাগজ আরও প্রবলভাবে চলিতে লাগিল এবং নিয়মতন্ত্রপ্রণালী-প্রবর্ত্তকগণ পূর্ণোদ্যমে তাঁহাদের প্রচারকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। শিবনাথ এই আন্দোলনের পুরোভাগে রহিলেন।

যখন ব্রাহ্ম-সমাজে এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, তখন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ এই তিনজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের জন্য যেহেতু কোন রাজনৈতিক সভা নাই এবং যেহেতু British Indian Association-এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সভ্য হইবার উপায় নাই, সেইহেতু

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য একটী রাজনৈতিক সভার প্রতিষ্ঠা করা যাউক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এই প্রস্তাব করা মাত্র তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন না। তবে তিনি অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষের দলকে এই সভায় লইতে নিষেধ করিলেন। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে কয়েকটী সভা হইয়া স্থির হইল যে, "ভারত-সা" নাম দিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান খাড়া করিতে হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, 'ভারত-সভা' স্থাপনের প্রস্তাব করা মাত্র অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ খ্রীষ্টান আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া ও নিজে সম্পাদক হইয়া Indian League নামক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য একটী সভার প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম্ম বুঝা গেল। কিন্তু শিবনাথ প্রভৃতি তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া এলবার্ট হলে প্রকাশ্য সভা করিয়া আনন্দমোহন বসুকে সম্পাদক করিয়া 'ভারত-সভা'র প্রতিষ্ঠা করিলেন। যেদিন ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয় সেদিন সুরেন্দ্রনাথের একটী পুত্র মারা যায়, তিনি সেই শোক বক্ষে করিয়াও সভার উদ্বোধনে যোগদান ও নানা প্রকার সাহায্য করেন। শিবনাথ 'ভারতসভা'র চাঁদা আদায় করিবার ভার লন। তখন ৯৩নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে 'ভারত-সভা'র আফিস অতি শোচনীয়ভাবে ছিল। এইখানে থাকিতেই শিবনাথ ব্রহ্মসমাজের কার্য্যে প্রাণমন ঢালিয়া দেন।

১৮৭৬।৭৭ সালে শিবনাথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাসমূহ একত্রিত হইয়া "পুষ্পমালা" নামে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে এক আশ্চর্য্য ব্যাপারে পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হয়। শিবনাথ হরিনাভি-ব্রাহ্ম-উৎসবে গিয়া ছিলেন, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জ্বর হয়, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে কাসি এবং কাসির সহিত রক্ত পর্য্যন্ত দেখা যায়। শিবনাথ

ভবানীপুর হইতে পিতাকে একবার অন্তিমকালে দেখা করিবার জন্ত লেখেন। শিবনাথের পিতা দরিদ্র হইলেও পুত্র-স্নেহের প্রাবল্যে তাঁহার পত্নীকে (শিবনাথের মাতাকে) সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসেন এবং শিবনাথ যে বাড়ীতে ছিলেন, সেই বাড়ীর পার্শ্বে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া শিবনাথের মাতাকে তথায় রাখিলেন। মাতা পুত্রের সেবা করিতে লাগিলেন; প্রাণপণে ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পিতা কবিরাজ ডাকিয়া আনিয়া শিবনাথের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। রোগশয্যাশায়ী পুত্রের প্রতি অনাবিল অপত্যস্নেহের নিকট আজ যত কিছু ক্রোধ ভস্মীভূত হইল। এই সময়ে খোদাই নামক এক ভৃত্যও প্রাণপণে শিবনাথের সেবা করিয়াছিলেন। রোগমুক্ত হইয়া শিবনাথ মুঙ্গেরে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য যান, তথায় দোতালার উপর হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার এক বৎসর দশ মাসের কন্যা সরোজিনী মারা যায়। অতঃপর পত্নীদ্বয়কে মুঙ্গেরে রাখিয়া আসিয়া এবং নিজে কলিকাতায় আসিয়া স্থির করিলেন যে, তিনি আর সরকারী চাকুরী করিবেন না, পরন্তু ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যেই দেহ-প্রাণ সমর্পণ করিবেন। কিন্তু কোচবিহারের নবীন মহারাজের সহিত কেশব আপন কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করায় সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, শিবনাথ বিবাহের বিরুদ্ধ সম্প্রদায়দিগের সহিত যোগদান করেন। অতঃপর শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের হস্তে পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়া শিবনাথ স্বাধীন হন এবং স্বাধীনভাবে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে যোগদান করিতে থাকেন। কোচবিহার-বিবাহের প্রতিবাদ করিবার জন্য শিবনাথের চেষ্টায় "সমালোচক" নামক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক, তদনন্তর Brahmo Public Opinion নামক ইংরাজী কাগজ বাহির হয়। শিবনাথ বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু শিবনাথ নরম মানুষ বলিয়া সমালোচকের সম্পাদনের-ভার অতঃপর

দ্বারিক গাঙ্গুলীর ও দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর হস্তে প্রদান করা হয়। কেশববাবু কোচবিহারে কন্যার বিবাহ দিয়া ফিরিয়া আসিলে যাঁহাদের চেষ্টায় তিনি আচার্য্য-পদ হইতে অপসৃত হন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তন্মধ্যে প্রধানতম। মন্দির দখল অথবা আচার্য্যের বেদী অধিকার প্রভৃতি ব্যাপারে যদিও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন না, তথাচ তিনি কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধ দলকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে বিরুদ্ধবাদীর দল টাউনহলে সভা ডাকিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কোচবিহার-বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া শিবনাথ এই সময়ে "এই কি ব্রাহ্মবিবাহ" নাম দিয়া একখানি পুস্তিকাও লিখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের যাহা কিছু কাজ শিবনাথের প্রথমে আরম্ভ হয় এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার যাহা কিছু সাধনা ও কর্ম্মশক্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে শিবনাথের উপর নিয়মাবলী প্রণয়নের, মফঃস্বলস্থ সমাজসকলের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের, ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র Brahmo Public Opinion-সম্পাদনের, ব্রাহ্মসমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিবার ও সহকারী সম্পাদকতা করিবার এবং "তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা"র সম্পাদকতার ভার অর্পিত হইল। "তত্ত্বকৌমুদী" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হইল। ইহা ছাড়া শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হইলেন। শিবনাথ বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রচারের জন্য বাহির হইলেন। মতিহারী, বাঁকীপুর, আরা, লক্ষ্ণৌ হইয়া তিনি মুঙ্গেরে পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে প্রসন্নময়ীকে সঙ্গে লইয়া পীড়িতা কন্যা হেমলতাকে দেখিতে কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া "তত্ত্বকৌমুদী"র সম্পাদন ও ব্রাহ্মসমাজের উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্যের কার্য্য করিতে থাকেন। তখন উপেন্দ্রনাথ বসুর ঠাকুর-দালানে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা চলিত। শেষে ২১১নং

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একখণ্ড জমি সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেক ব্রাহ্ম এক মাসের আয় মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্যে দিয়া মন্দিরটী নিম্মাণ করেন। অতঃপর শিবনাথের অনুরোধে আনন্দমোহন বসু সিটি স্কুল নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন। শিবনাথ উক্ত স্কুলের সেক্রেটারী হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুলে পড়াইতে লাগিলেন। সিটি স্কুল বেশ জমিয়া উঠিলে শিবনাথ আনন্দমাহনের সহিত পরামর্শ করিয়া "ছাত্র-সমাজে"র প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্কুল-কলেজে যে ধর্ম্মহীন শিক্ষা দেওয়া হয় সেই অভাব-পূরণের জন্য ছাত্রসমাজ স্থাপিত হয়। এই সময়ে শিবনাথ আবার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, পঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, গুজরাট ও মাদ্রাজে প্রচারার্থ যান। যাইবার সময় মাত্র ৮৲টী টাকা সম্বল করিয়া বাহির হন। তিনি সিন্ধু, বোম্বাই প্রভৃতি নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে শিবনাথকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও এফ-এ পরীক্ষার সংস্কৃতের পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। প্রথম প্রথম পরীক্ষকের পারিশ্রমিক ৫।৬ শত টাকা পাইতেন, ক্রমে তাহা কম হইয়া আসে। পুস্তকাদির বিক্রয়েও শিবনাথ কয়েক হাজার টাকা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি জীবনে কিছুই সঞ্চিত রাখেন নাই। তাঁহাকে সঞ্চয় করিতে বলিলে তিনি বলিতেন, "যদি টাকা সঞ্চয়ই করিব, তবে বিষয়ের পথ ছাড়িয়া এই ধর্ম্মপ্রচারের পথে আসিলাম কেন?" তিনি সমাজের সেবা করিয়া যাহা পাইতেন তাহা হইতে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত না, কাজেই পরীক্ষক ও গ্রন্থকার-হিসাবে তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তৎসমস্তই ব্যয় করিয়াছিলেন। শিবনাথের মজিলপুরস্থ ভদ্রাসনে পর্ণকুটীর ছিল, তিনি তাহা পাকা করিয়া দেন। পিতার আমলের যে সমস্ত ঋণ ছিল সে সমস্তও পরিশোধ করেন। তাহা ছাড়া স্বোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা

সাধনাশ্রম, ব্রাহ্মবালকনিবাস, বাঁকিপুরের রামমোহন রায় সেমিনারী প্রভৃতি বাঁচাইয়া রাখেন। দার্জ্জিলিংয়ে যখন উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শিবনাথ তাহা উদ্বোধন করিতে যান; কিন্তু তখন শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত রেলপথ কেবল পাতা হইতেছিল। যাঁহারা অর্থশালী লোক তাহারা টোঙ্গায় করিয়া দার্জ্জিলিং যাইতেন। শিবনাথের সেরূপ টাকা না থাকায় এবং ব্রাহ্মসমাজ তত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে না পারায়, শিলিগুড়ি হইতে শিবনাথ প্রথমে ঘোড়ায় চড়িয়া দার্জ্জিলিং রওনা হন, কিন্তু পথিমধ্যে যাইয়া যখন তিনি শুনিলেন যে, ঘোড়াটী মাদী ও গর্ভিণী, তখন তিনি গর্ভিণী ঘোড়াকে বৃথা কষ্ট না দিয়া ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে সেই খাড়া উঁচু পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কার্সিয়ঙ্গে উপনীত হইলেন। তথা হইতে অন্য ঘোড়ায় চড়িয়া দার্জ্জিলিংয়ে পৌঁছিয়া মন্দিরপ্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই শিবনাথ মাদ্রাজে গেলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণের আহার শূদ্রের দেখিবার অধিকার নাই। এমন কি, চেটি প্রভৃতি কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতার আহার পুত্রের দেখিবার অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ শূদ্র একসঙ্গে পথে পথিক হইলে ব্রাহ্মণকে কাপড়ের কাণ্ডার খাটাইয়া তন্মধ্যে আহার করিতে হয়। ইহা দেখিয়া শিবনাথ জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিলেন। ফলে মাদ্রাজ সহরে হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। অতঃপর শিবনাথ নিমন্ত্রিত হইয়া পরশুবাকম্, মাইলপুর প্রভৃতি মাদ্রাজের অনেক উপনগরে বক্তৃতা করেন। মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পর শিবনাথের উপর অর্দ্ধনির্ম্মিত উপাসনা-মন্দিরটি সম্পূর্ণ করিবার ভার অর্পিত হইল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৮০ সালের মাঘোৎসব অর্দ্ধনির্ম্মিত মন্দিরেই সম্পন্ন হয়। ১৮৮১ সালের ১০ই মাঘ মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে আবার মাদ্রাজ হইতে

আহ্বান আশায় শিবনাথ মাদ্রাজে গেলেন এবং তথায় গিয়া New Dispensation and Sadharan Brahma Samaj নামক ইংরাজী পুস্তক রচনা করিলেন। সেই পুস্তক মাদ্রাজ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মাদ্রাজ হইতে শিবনাথ প্রথমে কোইম্বাটুর নগরে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যান। সেখানে গিয়া দেখেন যে, তথায় জাতিভেদের এত বাড়াবাড়ি যে, অনেক খৃষ্টানের গলায় পর্য্যন্ত পৈতা দেখা যায়। তাঁহার সঙ্গী রঙ্গনাথম্ মুদালিয়ার শূদ্র বলিয়া তাঁহাকে একটি অন্ধকারময় গোয়াল ঘরে খাইতে দেওয়া হয়। তার পর আর একটি লোক "পঞ্চমা" শ্রেণীভুক্ত বলিয়া সে কখনও শিবনাথের সহিত একাসনে বসিত না। শিবনাথ সেই পঞ্চমার বাড়ীতে গিয়া দুধ পান করিলেন। ফলে মাদ্রাজ সহরে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়—ব্রাহ্মণ হইয়া পঞ্চমার বাড়ীতে আহার, ইহা মাদ্রাজের ব্রাহ্মণগণ কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই।

মাদ্রাজ হইতে শিবনাথ বাঙ্গালোরে যান। তথায় কয়েকটা বক্তৃতা করিয়া মাদ্রাজ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবার কলিকাতায় আসিয়া শিবনাথ ৫।৬ বৎসর কাল একরূপ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তবে এই সময়ের মধ্যে তাঁহার উদ্যোগে বালকবালিকাদের জন্য দুইটি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন শিবনাথের কন্যা হেমলতা, ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা লাবণ্য প্রভা প্রভৃতি। ইঁহাদের চেষ্টায় বালকবালিকাদের জন্য "মুকুল" নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়, শিবনাথ উহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ইহার পর ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র Brahmo Public Opinionএর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া Indian Messenger নামক পত্র প্রকাশ করা হয়। শিবনাথ তাহার সম্পাদক হন। এই পত্র ছাপাইবার জন্য শিবনাথ নিজে টাকা কর্জ্জ করিয়া Brahmo Mission Press নাম দিয়া একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই

প্রেসের যাবতীয় কার্য্য শিবনাথকেই একরূপ করিতে হইত—তিনি মায় হরপ জোগাড় হইতে মুদ্রাকর পর্য্যন্ত স্থির করিতেন।

১৮৮৪ সালের প্রথম ভাগে কেশবচন্দ্র সেন স্বর্গারোহণ করেন মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বহুমূত্র রোগ হইয়াছিল। এই রোগ সত্ত্বেও তিনি নববিধানের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেজন্য গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারী প্রাতে কেশবচন্দ্র দেহত্যাগ করিলে যাঁহার নগ্নপদে সেই শবদেহের অনুগামী হইযাছিলেন শিবনাথ তাঁহাদেব অন্যতম। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুতে শিবনাথ বালকের ন্যায় রোদন করিয ছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৮৲ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পয্যন্ত শিবনাথের জীবনে বিশেষ কিছু ঘটন ঘটে নাই। তবে এই সমযের মধ্যে শিবনাথ, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, রাম-কুমার বিদ্যারত্ন ও শশিভূষণ বসু কার্সিযঙ্গে গিয়া একটি বাডী ভাড লইয়া নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের চিন্তা, ধ্যান ও উপাসনা করিতে লাগিলেন একমাস কাল তাহারা তথায় থাকিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন। সেই সমযে শিবনাথ তাঁহার "হিমাদ্রি-কুসুম" নামক কবিতা-গ্রন্থ লেখেন, উহা বর্দ্ধিতাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

অতঃপর কলিকাতায ফিরিয়া শিবনাথ আসাম প্রদেশে ধুবডী, গোয়ালপাডা, গৌহাটি, তেজপুর, নওগাঁ, শিবসাগর, ডিব্রুগড ও শিল• প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৮৮৹ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ তারযোগে সংবাদ পান যে, কাশীধামে তাঁহার পিতাঠাকুর ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত। তার পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ শিবনাথ কাশীধামে রওনা হইলেন এবং তৎপরদিন পিতার রোগশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন, শিবনাথ কাদিতে কাঁদিতে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে আসিয়া বিরাজমোহিনীকে বলিবেন, 'বাবা যদি এ সমযও আমার সহিত কথা না বলিলেন, তাহা হইলে

ডাক্তারকে কি করিয়া রোগের বিবরণ বলিব?" বিরাজমোহিনীর মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা সুদীর্ঘ আঠার বৎসর পরে শিব নাথের দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং কথা বলিলেন। সে যাত্রা শিব-নাথের পিতা আরোগ্যলাভ করেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ, দুর্গামোহন দাস ও পার্ব্বতীচরণ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। লণ্ডনে পৌঁছিয়া উত্তর লণ্ডনে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরাজ পরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পারি-বারিক জীবন সম্বন্ধে শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—

'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণ স্বাধীনভাবে সকল স্থানে, সকল আলোচনাতে, সকল কাজে যোগ দেন, তাহাতে যেন কাহারও মনে না হয় যে, তাহাদের মধ্যে সামাজিক শাসন নাই। এমন কঠিন সামাজিক শাসন অল্পই দেখা যায়। আমি যাঁদের বাড়ীতে থাকিতাম, সে বাড়ীতে দেখি-যাছি, যদি কোনও দিন বাইরের দরজার একটা চাবি সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলিতাম এবং ফিরিতে অনেক রাত্রি হইত, তখন দেখিতাম দ্বারে আসিয়া আঘাত করিলেই সিঁড়িতে উপর হইতে নামিবার খট্ খট্ শব্দ শোনা গেল। একটি মেয়ে আসিয়া দ্বার খুলিলেন, কিন্তু আমি খট্ করিয়া দ্বার খুলিতে না খুলিতে তিনি অন্তর্দ্ধান। ছয় সাত মাস পর্য্যন্ত তাঁহাদের বাড়ীতে ছিলাম, মেয়েরা কোন ঘরে ঘুমাইত তাহা জানিতাম না। সে দেশে মেয়েদের শয়ন-ঘরে পুরুষের প্রবেশের ন্যায় নিন্দনীয় কাজ আর কিছুই নাই। সেখানে মেয়েপুরুষে বৈঠক ঘরে একত্র বসা, মেশা, রাস্তাঘাটে একত্র বেড়ান নিষিদ্ধ নয়; কিন্তু আদব-কায়দার এত বাঁধাবাঁধি যে তার একটু লঙ্ঘন করিলেই বন্ধুতার বিচ্ছেদ ঘটে। এইরূপ আদব-কায়দার অনেক বাঁধন আছে, স্বাধীনতার সঙ্গে শাসনও আছে।

শিবনাথ ছয়মাসকাল ইংলণ্ডে ছিলেন। এই ছয়মাসে তিনি

তথাকার উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা, মিউজিয়াম, লাইব্রেরী, কল-কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-পাঠশালা প্রভৃতি সমস্ত পরিদর্শন করেন। মে মাসে শিবনাথ লণ্ডনে যান, নভেম্বর মাসে তিনি ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে ফিরিয়া শিবনাথ আবার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং ইন্দোরে যান। ইন্দোর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শিবনাথ বোম্বাই হইয়া পুনরায় মাদ্রাজে যান। মাদ্রাজ হইতে তিনি বাঙ্গালোর হইয়া পশ্চিম মালাবার-উপকূলস্থ কালিকট নগরে যান। সেখানে গিয়া দেখিতে পান যে, ব্রাহ্মণ বা গুরুজন দেখিলে নায়ার বা শূদ্র স্ত্রীলোকদিগকে বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিতে হয়। তাহা নাকি ব্রাহ্মণ ও গুরুজনদিগের প্রতি সম্ভ্রম-প্রকাশের চিহ্ন। নায়ারেরা বীরপুরুষ। আবার ব্রাহ্মণ দেখিলে নায়ারেরা পথিমধ্যে ১০,১২ হাত দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, যাহাতে উহাদের বাতাস ব্রাহ্মণের গায়ে না লাগে। নায়ার ও শূদ্র বালিকাদের বিবাহের নিয়ম নাই। বিবাহের বয়স হইলে স্বজাতীয় একটি বালকের সঙ্গে একদিন নামমাত্র বিবাহ হয়, একটা খাওয়া-দাওয়া হয়, কিন্তু তাহা বিবাহ বলিলে যাহা মনে হয় তাহা নহে, বিবাহের পরদিন হইতে তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ রহিত হয়। তৎপর কন্যা মাতৃভবনেই থাকে। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আত্মীয়-স্বজন একটি ব্রাহ্মণ যুবককে আনিয়া কন্যাটির সহিত পরিচয় করাইয়া দেন, সেই যুবকই কন্যাটির প্রকৃত পতি হইয়া দাঁড়ায়। যুবতী মনে করিলে সেই যুবকের পরিবর্ত্তে আবার অন্য যুবককে পতিত্বে বরণ করিতে পারে। সে ব্যক্তি কার্য্যতঃ পতি হইলেও সন্তানদিগের সম্বন্ধে তাহার কোনও দায়িত্ব থাকে না; সে দায়িত্ব তাহাদের মাতুলের উপর থাকে, তাহারা মাতুলেরই ধনের অধিকারী হয়।

এদিকে যেমন এই নিয়ম, অপর দিকে নাম্বুরী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রথম পুত্র বংশরক্ষার জন্য বিবাহ করে, অপর পুত্রেরা বিবাহ না করিয়া

নায়ার ও শূদ্রজাতীয় স্ত্রীদিগের সহিত এবং আবশ্যক হইলে একাধিক শূদ্র রমণীর সহিত সংগত হইবার জন্য থাকে। ফলে অনেক ব্রাহ্মণ-কন্যাকে পতি-অভাবে চিরকুমারী অবস্থায় থাকিতে হয়। নায়ার-নারীরা নাম্বুরী ব্রাহ্মণদিগের সহিত উপগত হওয়া সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে। কালিকট হইতে শিবনাথ মাদ্রাজে এবং তথা হইতে কোকনদে গমন করেন। তথায় গিয়া শিবনাথের পীড়া হয়, সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনী ও কন্যা হেমলতা তথায় যান। তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করিয়া শিবনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শিবনাথ Dalhouse Institute-এ আচার্য্যের কার্য্য করিতে লাগিলেন। তথায় একেশ্বরবাদী ইংরাজ ও ফিরিঙ্গীরা সমবেত হইত। তৎপর তিনি ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে উপাসক-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া নিজে আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য ও উপাসক-মণ্ডলীর ব্যবহারের জন্য "ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী" নামে একটি লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করিলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কন্যা হেমলতার সহিত ডাঃ বিপিন-বিহারী সরকারের বিবাহ হয়। তৎপর সাধনাশ্রমের কুঞ্জলাল ঘোষের সহিত তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনীর বিবাহ হয়। ১৮৯৯ সালে এই বিবাহ হইয়াছিল। ঐ ১৯০৬ সালের ১৫ই নবেম্বর সুহাসিনী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯০১ সালে শিবনাথের পুত্রের সহিত কটকের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম মধুসূদন রাওর দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হয়।

এই সময়ে শিবনাথ মন্দিরে যে সমস্ত ধর্ম্মোপদেশ দিতেন সেগুলি "ধর্ম্মোপদেশ" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। "যুগান্তর" ও "নয়নতারা" নামে দুইখানি উপন্যাস এবং মাঘোৎসবের উপদেশ ও

বক্তৃতা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক গ্রন্থ ও তাহার রচিত প্রবন্ধসকল সংগৃহীত হইয়া প্রবন্ধাবলী নামে প্রকাশিত হয়।

১৯০১ সালের ৩রা জুন প্রসন্নময়ী স্বর্গারোহণ করেন। ১৯০৭ সালের মার্চ্চ মাসে শিবনাথ অন্ধ কন্‌ফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র লাল রায়

ঢাকা-ভাগ্যকুলের জমিদার ও ব্যাঙ্কার রায় হরেন্দ্রলাল রায় বাহাদুর

রায় হরেন্দ্রলাল রায় বাহাদুর ভাগ্যকুলের সুপরিচিত রায়বংশের অন্যতম বংশধর। এই রায়বংশ গত দুই শতাব্দী কাল করিয়া জনসাধারণকে সাহায্য করিয়া আসিতেছে বলিয়া বিক্রমপুরের অধিবাসীমাত্রই ইঁহাদিগকে সম্মান করেন। নিম্নে ইঁহাদের বংশতালিকা দেওয়া হইল :—

হরিপ্রসাদ রায়
|
হরলাল রায়
|
হরেন্দ্রলাল রায়
|

শ্যামেন্দ্রলাল রায়	বীরেন্দ্রলাল রায়	রণেন্দ্রলাল রায়	সরোজেন্দ্রলাল রায়
১। অরবিন্দলাল রায়	১। গোবিন্দচন্দ্র রায়	তিন কন্যা	১। উষারঞ্জন
২। জগদিন্দ্রলাল রায়	২। কেশবচন্দ্র রায়		২। প্রমোদরঞ্জন
৩। সমরেন্দ্রলাল রায়			
৪। পুরুষোত্তমলাল রায়			
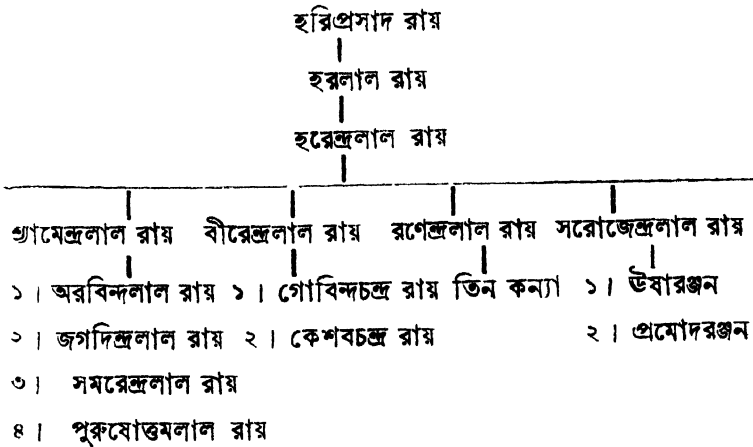
শ্রীযুত হরেন্দ্রলাল বাবু হরলাল রায়ের একমাত্র পুত্র। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। জনসাধারণের হিতকর অনেক কাজ তিনি করিয়া ছিলেন। বাড়ীতে পূজা-পার্ব্বণ, নিমন্ত্রণ প্রভৃতিতে হরলাল দুই হাত দিয়া অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার দ্বারা বংশের চিরন্তন খ্যাতি দ্বিগুণপরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। বাঙ্গালা ১২৬৬ সালের ৪ঠা

ফাল্গুন হরেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রামে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয়। পরে তিনি কলিকাতা হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হন। তাঁহার নিজের জমিদারীর তত্ত্বাবধান করার কেহ না থাকায় অতি অল্প বয়সে তাঁহাকে লেখাপড়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যানুশীলনের বলবতী ইচ্ছা থাকায় তিনি স্বগৃহে অনেক দূর পাঠ করিয়াছেন। তিনি অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা হইতেই সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি শিক্ষা-প্রচারের জন্য সর্ব্বদাই যত্নশীল।

জনহিতকর কার্য্য

রায় হরেন্দ্রলাল রায় বাহাদুর বদান্যতা-গুণে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি গোপনে অভাবগ্রস্তকে এত দান করেন যে, তাহার কোন হিসাবপত্র নাই। কেবলমাত্র তাঁহার প্রকাশ্য দানের দুই একটি ঘটনা এস্থলে উল্লেখ করা গেল। বাঙ্গালা ১৩০৩ সালে তিনি ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে মুন্সীগঞ্জে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজটির নাম "হরেন্দ্রলাল কলেজ" রাখা হইয়াছিল। কিন্তু মুন্সীগঞ্জের অধিবাসীদের দলাদলির ফলে কলেজ-টির অকালে অস্তিত্ব-লোপ হয়। এখন আবার মুন্সীগঞ্জের অধিবাসীদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হইয়াছে এবং তাঁহারা একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। স্বগ্রামে তিনি একটি প্রথম শ্রেণীর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা ও রক্ষাকল্পে তাঁহার প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯১৯ সালের প্রবল ঝড়ের পর তিনি এই বিদ্যালয়টির সংস্কারকল্পে ১০ দশ হাজার টাকা ব্যয় করেন।

রায় হরেন্দ্রলাল বহুকাল যাবৎ ঢাকার পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন. পূর্ব্ববঙ্গের অনেক টোলে তিনি প্রভূত টাকা

দান করিয়াছেন। মুন্সীগঞ্জের বালিকা বিদ্যালয় তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। এই বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য তিনি ২২ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজ লাইব্রেরীর জন্য তিনি ৪৫০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। দেশের আরও অনেক স্কুল-কলেজে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে ময়মনসিংহের বাজিতপুর হাইস্কুলের বাটী তৈয়ারী করিবার জন্য তাঁহার দান অন্যতম। মুন্সীগঞ্জে হরেন্দ্রলাল লাইব্রেরী নামে লাইব্রেরী ও সাধারণ পাঠাগার তাঁহার দানের অন্যতম নিদর্শন। কলিকাতা ৫৩।এ শোভাবাজার ষ্ট্রীটে যে সরোজেন্দ্র স্মৃতি-লাইব্রেরী ও সাধারণ পাঠাগার আছে রায় হরেন্দ্রলাল রায় বাহাদুর তাহাতে সাহায্য করিয়া থাকেন। দেশে শিক্ষা-বিস্তারই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। তিনি অনেক ছাত্রকে বৃত্তি, পদক ও পারিতোষিক দিয়া থাকেন।

মুন্সীগঞ্জকে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন। তথায় পাবলিক লাইব্রেরী ও সাধারণ পাঠাগার আছে। তত্রত্য হাঁসপাতাল তাঁহার বদান্যতার অন্যতম উদাহরণ। মুন্সীগঞ্জের "রোণাল্ডসে পার্ক" তাঁহারই চেষ্টায় নির্ম্মিত হয়। মুন্সীগঞ্জের বালিকাবিদ্যালয় তাঁহার স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের দানশীলতার পরিচায়ক।

দেশের দুঃস্থদের সুচিকিৎসার জন্যও তিনি সর্ব্বদা তৎপর। ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হাঁসপাতালের সংলগ্ন "র‍্যাঙ্কিন আউট-ডোর ওয়ার্ড" তাঁহারই সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। এই ওয়ার্ডের জন্য তাঁহার ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হাঁসপাতালের জন্য তিনি ৪ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন। এই হাঁসপাতালের তিনি আজীবন সদস্য। মুন্সীগঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয়ের অট্টালিকা-নির্ম্মাণ-তহবিলে ১ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ভাগ্যকুল দাতব্য ঔষধালয়ের জন্যও তিনি একহাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। শিলংয়ের

পশুদংশন হাঁসপাতালে তিনি অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ভাগ্যকুল মুন্সীগঞ্জ ও ভৈরব দাতব্য চিকিৎসালয়ে এখনও তিনি অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। শ্রীনগর ও শিলচর থানার এলেকাধীন কয়েকটী ডাক্তারখানায় তিনি মোটা রকমের টাকা দিয়াছিলেন। ভাগণ্ডী এবং মুন্সীগঞ্জের দাতব্য ঔষধালয়ে তিনি অনেক অর্থ দান করিয়াছেন।

গ্রামের উন্নতিও তাঁহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করে নাই। ইহার জন্য তিনি প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ঢাকা জেলার নগর-নন্দীতে পাঁচটি বড় বড় পুষ্করিণী খননার্থ তিনি দশহাজার টাকা ব্যয়-ভার বহন করেন। ঢাকা জেলার চৈনাবাড়ীতে একটি বৃহদাকার পুষ্করিণী খননের জন্য তিন হাজার, ২৪ পরগণার খরম্বা গ্রামে পুষ্করিণী খননের জন্য ৫ হাজার, ২৪ পরগণার আমিনপুর ও মণিরামপুর গ্রামে দুইটি পুষ্করিণীর জন্য ২৫০০৲ টাকা, ঢাকা ঢান-কুনিয়ায় একটি পুষ্করিণী খননের জন্য ৩ হাজার টাকা, ঢাকা মান্দ্রায় একটি পুষ্করিণী খননের জন্য ৫ শত টাকা ও ফরিদপুর জেলার মোক্তারচর ও ভাণ্ডারখোলার পুষ্করিণীর জন্য ১ হাজার টাকা, বাখরগঞ্জ জেলার আহরভাঙ্গা, আউলিয়াপুর ও গরিয়াবাণিয়ায় পুষ্করিণীর জন্য ১৫ শত টাকা, নারায়ণগঞ্জে স্নানের ঘাট নির্ম্মাণার্থে ৫ হাজার টাকা, পটুয়াখালী জলের কলের জন্য বহু টাকা এবং মুন্সীগঞ্জ রোণাল্ডসে পার্ক নির্ম্মাণার্থ ১ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ফরিদপুরের প্রস্তাবিত জলের কলের জন্যও তিনি ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জ ও কাশীপুর এবং ঢাকা জেলার বেটকা ইউনিয়নে তিনি প্রকাশ্য রাস্তা-নির্ম্মাণের জন্য জমি দান করিয়াছেন। ভাগ্যকুল ইউনিয়নেও তিনি জমি দান না করিলে আজ ঐ ইউনিয়ন রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ করিতে পারিত না।

ভাগ্যকুল, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, নারায়ণগঞ্জ ও কলিকাতায় ঠাকুরের দৈনিক সেবার জন্য তিনি অর্থ দান করিয়াছেন। বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্ম্ম-উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বিস্তর অর্থ ও বস্ত্র দান করেন এবং অনেক ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করেন। অনেক ব্রাহ্মণ-তনয়কে তিনি উপনয়নের সময় সাহায্য করিয়া থাকেন। দুর্ভিক্ষ ও ১৯১৯ সালের প্রবল বাত্যার সময় তিনি দুঃস্থ লোকদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। মুন্সীগঞ্জে একটি নূতন জগদ্ধাত্রী মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ৫৫০৲ টাকা সাহায্য করিযাছিলেন। অতিথি ও অভ্যাগতকে তিনি পরমযত্নসহকারে সৎকার করেন।

ক্রীড়া-কৌতুকেও তিনি বিশেষ যত্নশালী। কলিকাতা ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবে তিনি অর্থসাহায্য করেন। অন্যান্য ক্লাবেও তিনি প্রভূত অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন। ভাগ্যকুলে প্রতি বৎসর "হরেন্দ্রলাল কাপ", সরোজেন্দ্র মেমোরিয়াল সিল্ড ও হরেন্দ্রলাল সিক্‌স্ প্রত্যেক বৎসর ভাগ্যকুলে প্রতিযোগীকে দেওয়া হইয়া থাকে। রায বাহাদুর হরেন্দ্র-লাল এইসমস্ত প্রতিযোগীর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। ক্রীড়কদের একটি কৌন্সিলের উপর এই সমস্ত পারিতোষিক দিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন। খেলায় উৎসাহ দিবার জন্য তিনি ভাগ্যকুলে একখণ্ড বড জমি দান করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর হরেন্দ্রলাল অন্যান্য কার্য্যে যে সমস্ত দান করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা গেল ঃ—

১।	কলিকাতা লেডী ডাফরিণ ফণ্ড (আজীবন সদস্য)	৫০০০৲
২।	ঢাকা অনাথাশ্রম	৫০০৲
৩।	লেডী লিটন ফণ্ড, মুন্সীগঞ্জ	৫০০৲
৪।	মুন্সীগঞ্জে লর্ড কারমাইকেলের পরিদর্শন-স্মৃতি-রক্ষা কমিটি	৫০০৲

৫।	মুন্সীগঞ্জ হরেন্দ্রলাল পাবলিক লাইব্রেরী	১১,১০০৲
৬।	কলিকাতায় সরোজেন্দ্র মেমোরিয়াল লাইব্রেরী	২০০০৲
৭।	১৯০১ সালে সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের দরবার উপলক্ষে	১০০০৲
৮।	১৯১১ সালে পঞ্চম জর্জ্জের দরবার	১২০০৲
৯।	ঢাকা রেস কোর্স	২৫০০৲
১০।	ঢাকা রেস	৩৮০০৲

১৯·৩ সালে ঢাকা প্রদর্শনীতে তিনি অর্থ সাহায্য করেন। ফরিদপুর শিল্প ও কৃষি-প্রদর্শনীতে তিনি বার্ষিক সাহায্য করিয়া থাকেন। মহারাণীর জুবিলি উপলক্ষে কিশোরগঞ্জে যে মেলা ও নানা স্থানে যে আমোদ হইয়াছিল তাহাতে তিনি অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

গত যুদ্ধের সময় তাঁহার কার্য্য

গত যুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার সমস্ত জাহাজ ইংরেজ সরকারের সাহায্যার্থ মেসোপটেমিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার নিজের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়াছিল। তিনি ৩০ হাজার টাকা মূল্যের যুদ্ধ-ঋণ-পত্র ক্রয় করিয়াছিলেন এবং আপন পুত্রদের নামে ৫ হাজার টাকা মূল্যের পোষ্ট্যাল ক্যাস সার্টিফিকেট ক্রয় করিয়াছিলেন। ঢাকা রিক্রুটীং ফণ্ডে তিনি অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন। আওয়ার ডে ফণ্ডে, ওয়াই-এম্ সি-এ ফণ্ডে, বেঙ্গলী ব্যাটালিয়ন ফণ্ডে তিনি প্রভূত টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জমিদারী মধ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে যাহারা যুদ্ধে যাইবে, তাহাদের খাজনা মাপ করা হইবে।

জনসমাজে হরেন্দ্রলাল

রায় বাহাদুর বাঙ্গালার অনেক প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কলিকাতার বঙ্গীয় মহাজন সভার তিনি ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট। ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হাঁসপাতাল, লেডী ডাফরিণ ফাণ্ড ও কলিকাতার কন্‌ষ্টিটিউসনাল ক্লাবের তিনি আজীবন সদস্য। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, বঙ্গীয় জমিদার সভা, পূর্ব্ববঙ্গীয় জমিদার সভা এবং ঢাকা নর্থব্রুক হলের তিনি সদস্য। এইসমস্ত সভার উন্নতিকল্পে তিনি প্রভূত টাকা দান করিয়াছিলেন।

উপাধি-লাভ

বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট, ঢাকা বিভাগের কমিশনার ও ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে তিনি অনেক প্রশংসাসূচক পত্র পাইযাছেন। ১৯০৫ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কৈসর-ই-হিন্দ্ স্বুবর্ণ পদক উপহার দেন। তৎপূর্ব্বে বিক্রমপুরের আর কেহ এই পদক পুরস্কার পান নাই। ১৯২৩ সালে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি পান। লর্ড লিটন ঢাকায একটি দরবার করিয়া তাঁহাকে উপাধি-প্রদানকালে বলেন—"আঠার বৎসর পূর্ব্বে আপনাকে নানাপ্রকার দাতব্য অনুষ্ঠানের জন্য "কৈসর-ই-হিন্দ্" সুবর্ণ পদক উপহার প্রদান করা হইয়াছে। তদবধি দাতা বলিয়া আপনার খ্যাতি আপনি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। গত যুদ্ধের সময় আপনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন। আপনি নিজের ও অপর জেলায় দান করিতে মুক্তহস্ত। গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনার প্রভাব বিশেষ মূল্যবান্।

স্বভাববৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব

ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, কলিকাতা, ত্রিপুরা ও সুন্দরবনে তাঁহার জমিদারী অবস্থিত। প্রজাবর্গের

কল্যাণের জন্য তিনি নানাস্থানে হাট বসাইয়াছেন, রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহাকে একজন আদর্শ জমিদার বলিলেও বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি একজন একনিষ্ঠ বৈষ্ণব; তবে আধুনিক বৈষ্ণবদের ন্যায় তাঁহার গোঁড়ামী নাই। তিনি বাড়ীতে যাবতীয় পূজাপার্ব্বণ আপন পদমর্য্যাদার অনুরূপ জাঁক-জমকের সহিত করিয়া থাকেন। তাঁহার আকৃতি স্থূল না হইলে উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে তিনি যুবার ন্যায় কর্ম্মক্ষম। তাঁহার ন্যায় উদার, সরল ও শিষ্টাচারী লোক কমই দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার চারি পুত্র; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রটি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

বরলা জমিদার
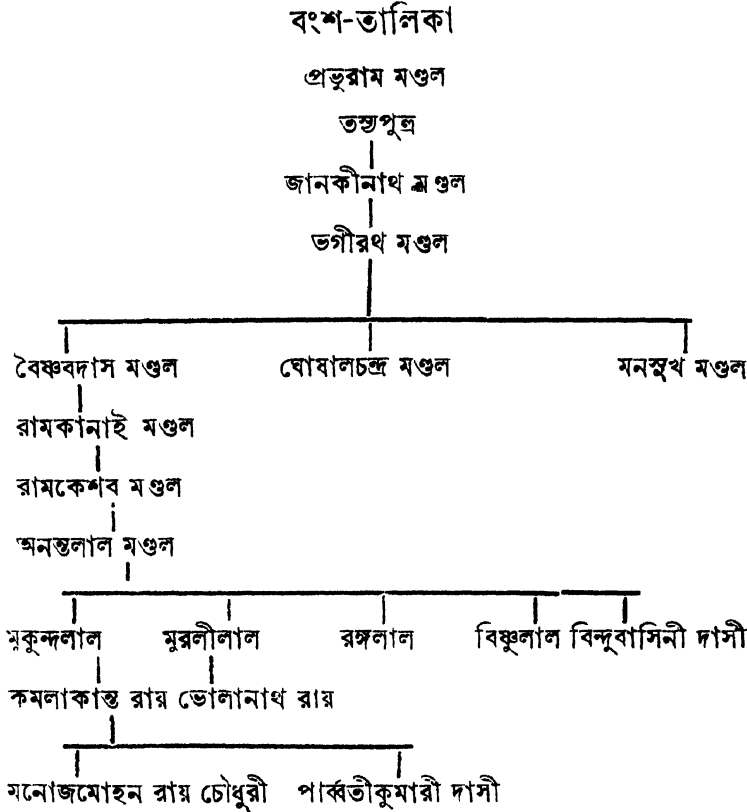
বীরভূম জেলায় বরলার জমীদার-বংশের নাম সুপ্রসিদ্ধ। এই প্রসিদ্ধি পুরুষ-পরম্পরা নানা সৎকীর্ত্তি দ্বারা অর্জ্জিত হইয়াছে।

এই বংশের পূর্ব্ব বাস বীরভূম জেলার অধীন দ্বারকানদীর তীরবর্ত্তী পশ্চিমগামিনী গ্রাম। যতদূর সম্ভব জানা যায়, তাহাতে অনুমান হয়,

এই বংশের উর্দ্ধতন পুরুষের মধ্যে জানকীনাথ রেশমের ব্যবসা দ্বারা অর্থ উপায় করিতে লাগিলেন এবং তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারিলেন যে, ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। ইহা বুঝিয়া তিনি একমাত্র মেধাবী পুত্র ভগীরথকে তাঁহার কার্য্যের সাহায্য ও রেশম-ব্যবসা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভের জন্য লিপ্ত করিলেন। পিতা পুত্র উভয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টা-যত্ন ও সাহসিকতার দ্বারা প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পরে দস্যুভয়ে অতিশয় ভীত ও কাতর হইয়া তথায় আর বসতি করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া তাঁহারা গোপনে তাঁহাদের অর্জ্জিত ধনাদি লইয়া ব্রাহ্মণীনদীর তীরবর্ত্তী বরলা গ্রামে ভাগিনেয়ের নিকট আসিয়া বাস করেন। ইহার কিছুদিন পরে জানকীনাথের অক্লান্ত পরিশ্রম-জনিত কষ্টে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং এতৎসঙ্গেই তাঁহাকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হয়। ভগীরথবাবু পিতৃশোকে অতিশয় অধীর হইয়া পড়াতেও তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিবল তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। তিনি একাকীই তাঁহার জীবিতাবস্থায় সামান্যমত ভূসম্পত্তি খরিদ করেন এবং নানারূপ ব্যবসায়ে বিশেষরূপ উন্নতি করতঃ মৃত্যুকালে বৈষ্ণবচরণ, ঘোষালচন্দ্র, মনসুখ নামে তিন পুত্র রাখিয়া ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। শাস্ত্রানুযায়ী পৈতৃক ধন-সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইবার পর সৌভাগ্য-লক্ষ্মী কাহার অঙ্কশায়িনী হন তাহা বুঝা যায় না। কেহ বা কার্য্যদোষে দরিদ্রতা প্রাপ্ত হয়। কেহ বা নিজের প্রতিভা-গুণে কার্য্যের দ্বারা উন্নতি সাধন করে। বৈষ্ণবচরণ ঈশ্বরদত্ত নানা রকম প্রতিভা-বলে ব্যবসা দ্বারা ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। উন্নতি-কালের প্রথমেই তিনি বুজুং গ্রামে অভীষ্টদেব ঠাকুরের বাটীতে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া রসিক নাগর ঠাকুর ও শ্রীধর শালগ্রাম ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করান এবং তথায় নাগর নামে বৃহৎ একটী পুষ্করিণী

খনন করাইয়া তাহার ঘাট বাঁধাইয়া দিয়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া দেন। রথযাত্রা হিন্দুদিগের একটী বিশেষ পর্ব্ব। তৎকালে এতদ্দেশের হিন্দুগণের রথযাত্রা-পর্ব্ব-উপলক্ষে মনস্তুষ্টি-সাধন জন্য তিনি একখানি বৃহদকার কারুকার্য্যবিশিষ্ট অত্যুচ্চ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রথ নির্ম্মাণ করেন; অদ্যাবধি শ্রীধর শালগ্রাম ঠাকুর রথযাত্রায় তথা হইতে আসিয়া রথারোহণ করতঃ এই বংশের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবচরণ যেমন নামে বৈষ্ণব ছিলেন তদ্রূপ কার্য্যেও বৈষ্ণবত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মপরায়ণ, সদালাপী, মিষ্টভাষী, দয়া ও দাক্ষিণ্য-গুণে ভূষিত ছিলেন। অনেক সাধু ব্যক্তি তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। তিনি কখনও কাহাকেও বিফলমনোরথ করিতেন না। এ বংশের দয়ার পরিচয় বৈষ্ণবচরণ হইতে পাওয়া যায়। যথা, উপযুক্ত পাত্রে দান, সম্মান, অন্ন ও বস্ত্রদান ইত্যাদি। বৈষ্ণবচরণ রামকানাই নামক একটী পুত্র রাখিয়া সজ্ঞানে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন।

রামকানাই পিতার আদর্শ পুত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়া পিতার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। রামকানাইবাবু যে সময়ে যেরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া চরিত্র ও আর্থিক উন্নতি করিতে হয় তাহা করিয়াছিলেন। তিনি কিছু জমিদারী আদি খরিদ করেন এবং তাঁহার মহাজনী কারবার ক্রমশঃ অনেকদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। ভোগ-বাসনায় অনাসক্তি তাঁহার বরাবরই ছিল। তাঁহার মত নিরভিমান লোক এতদঞ্চলে বিরল। বিপদে পড়িয়া কেহ উপদেশ বা সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা দান করিতেন। তিনি তাঁহার পিতার স্থাপিত রথযাত্রা-পর্ব্বের উন্নতি-সাধন করেন। রথযাত্রার দিন অনেক গরীব-দুঃখীকে অর্থ দান করিতেন। তিনি তাঁহার পিতার

ন্যায় সাধুব্যক্তিগণের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। কাহাকেও কোন বিষয়ে নিরাশ করিতেন না। এইসকল কারণে এতদঞ্চলের ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ তাঁহার বাধ্য হইয়াছিল। রামকানাইবাবু ক্রমোন্নতি-সহকারে রামগোবিন্দ ও রামকেশব নামে দুইটী পুত্রকে উপযুক্ত ও প্রাপ্ত-বয়স্ক করিয়া সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের ভার তাহাদের প্রতি ন্যস্ত করিয়া তিনি শান্তিতে চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধাদি অতি-সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

রামগোবিন্দ বঙ্গাব্দের ১১৯৮ সালে ও রামকেশব বঙ্গাব্দের ১২০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। উভয় ভ্রাতায় অল্প বয়সের ছোট বড় ছিলেন বটে; কিন্তু ভ্রাতৃ-বৎসলতায় এ জগতে আদর্শচরিত্র। পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেম যেরূপ ছিল শোনা গিয়াছে তাহাতে স্বতঃই প্রতীত হইতেছে যে করুণাময় ভগবান তাঁহাদের উভয়কেই একরূপ ভাবে নীতি শিক্ষা দিয়া এ জগতে লোকের মঙ্গলসাধনজন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পৈতৃক ধন-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া একান্নবর্ত্তী অবস্থাতেই জীবিতকাল অতিবাহিত করেন। রামকেশববাবু জমিদারী-পরিচালনার ভার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামগোবিন্দবাবুর প্রতি অর্পণ করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে রামগোবিন্দবাবু বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে জমিদারী আদি ও মহাজনী কারবারের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে থাকেন। রামকেশববাবুর বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মভাবও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি গয়া, মথুরা, কাশী, বৃন্দাবন ও জগন্নাথ প্রভৃতি সকল তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং তীর্থপর্য্যটনের পর বাটী আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, তীর্থস্থানে নিজের বাটী না থাকিলে ভাড়াটীয়া বাটীতে অবস্থান করিয়া তীর্থ-পর্য্যটনের প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না; তীর্থস্থানে গিয়াও অশান্তি ভোগ করিতে হয়। রামগোবিন্দবাবুর

চারি পুত্র—নন্দলাল, ব্রজলাল, সাতকড়ি ও মৃত্যুঞ্জয়। রামগোবিন্দ-বাবু অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নসহকারে সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। ফলে কিছু দিন পরে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাতে সমস্ত ভার দিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ভগবানের নাম স্মরণ করতঃ মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ পুত্র মৃত্যুঞ্জয়কে রাখিয়া ৫২ বৎসর বয়সে ১২৪৮ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর রাম-কেশববাবু মৃত্যুঞ্জয়কে নিজ পুত্রবৎই জ্ঞান করিয়া পুত্রের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন এবং মৃত্যুঞ্জয়বাবুর নামে কোনও কোনও সম্পত্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি তাহার ভ্রাতৃশোক হৃদয় হইতে কিছুতেই অপনোদন করিতে না পারিয়া এতই অধীর হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার এই বিস্তৃত কার্য্যগুলি নিজে পরিদর্শনে অশক্ত হইয়া যথাযোগ্য স্বনামধন্য উদারচেতা মনীষী ও যশস্বী পুত্র অনন্তলালের এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের হস্তে জমিদারী আদি ও মহাজনী কারবার প্রভৃতি অর্পণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় ধর্ম্মপ্রবণ আপনাকে হরিপাদপদ্মে স্থান দিবার ইচ্ছায় হরিগুণগানে সময় অতিবাহিত করিয়া নিজ জীবনকে শ্রীহরির পাদপদ্মে ১২৬৫ সালে মিলিত করেন। তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ অনেক অর্থব্যয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল।

অনন্তলাল বঙ্গাব্দের ১২৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তলালই বরলা জমীদার-বংশের স্থাপনকর্ত্তা। শৈশবে ও কৈশোরে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া অনন্তলাল নিজ বুদ্ধিবলে ও অসাধারণ অধ্যবসায়-গুণে তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে প্রায় সমস্ত জমিদারী ও তালুকাদি খরিদ করিয়া স্বনামপুরুষধন্য হইয়াছিলেন। নিরহঙ্কারিতা, সর্ব্বজীবে দয়া, ক্ষমা ও আড়ম্বরশূন্যতা তাঁহার চরিত্রের অলঙ্কার ছিল। তিনি যেমন সদ্‌গুণান্বিত ছিলেন তদ্রূপ ধার্ম্মিকও ছিলেন। জ্যেষ্ঠতাতের

মৃত্যুর পর যুবক অনন্তলাল সঞ্চিত অর্থদ্বারা দেশস্থ ভূসম্পত্তি খরিদ করিয়া এতদ্দেশস্থ ব্যক্তিসমূহকে সর্ব্বপ্রকারে প্রতিপালন ও বশীভূত করিয়া রাখিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল ; এই সময়ে পশ্চিম দেশনিবাসী গিরিধারী সিংহ নামীয় জনৈক পশ্চিমদেশীয় অতিশয় প্রতিভাশালী ছত্রি ব্রাহ্মণ তাঁহার বাটীর কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। অনন্তলাল নিজ বুদ্ধিমত্তার গুণে গিরিধারী সিংহের গুণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। কুরামগ্রাম-নিবাসী নীলমাধব সিংহের সহিতও যুবাকালে যথেষ্ট পরিচয় ও সৌহার্দ্দ ছিল

অনন্তলাল গিরিধারী সিংহকে দেওয়ান ও নীলমাধব সিংহকে সহকারী-রূপে নিযুক্ত করেন। কালক্রমে তিনি এই বিশাল রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার আয় প্রায় ১,২৮,০০০৲ টাকা হইবে। তিনি প্রজারঞ্জক ছিলেন, প্রজাহিতকর অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কালিন্দী-পুর (বর্ত্তমান নলহাটী ই আই রেলওযে ষ্টেশন) খরিদ করিয়া তথায় নিজ ব্যয়ে একটী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া মাসিক ৪০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করতঃ স্কুলটীর উন্নতি সাধন করেন এবং নলহাটীর পানীয় জলকষ্ট নিবারণ জন্য একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া ঘাট বাঁধাইয়া দেন। অদ্যাপি উক্ত পুষ্করিণী বাবুর পুষ্করিণী নামে খ্যাত। নলহাটী বাজারের উন্নতিসাধন জন্য তথায় চারিদিকে পাকা প্রাচীর-বেষ্টিত একটী হাট স্থাপন করেন এবং সদর রাস্তার পার্শ্বে কতকগুলি পাকা বাড়ীও নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি উক্ত বাড়ীগুলিতে ভাড়াটীয়া ব্যবসায়িগণ অবস্থান করিতেছেন। ইঁহার প্রপিতামহ যে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ইনি তাহার জীর্ণসংস্কার করেন ও নিজেও একখানি পিত্তলনির্ম্মিত রথ অনেক অর্থব্যয়ে করিয়া প্রস্তুত করান। শ্রীশ্রী৺রামচন্দ্র দেব ঠাকুর অনন্তবাবুর সময়েই স্থাপিত হয়। রথযাত্রার দিনে শ্রীশ্রী৺রামচন্দ্র দেব ঠাকুরই পিত্তল-রথে আরোহণ করিয়া বাবুবংশের মঙ্গল সাধন করেন। এখনও রথযাত্রার দিন রীতিমত মেলা

ও বহুলোকর সমাগম হইযা থাকে। অনন্তবাবুর সময়েই এই বিস্তৃত বাটী ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হইযাছিল। ইহার জ্যেষ্ঠতাত বরলা গ্রাম জমীদারের নিকট নিজে পত্তনী বন্দোবস্ত লইবার চেষ্টায় ছিলেন কিন্তু তাঁহাব সে বাসনা পূর্ণ হয নাই। অনন্তবাবুই ববলা পত্তনী তালুক-রূপে বন্দোবস্ত লন। অনন্তবাবু বরলার জমীদাব হইয়াই শ্রীশ্রী৺ শারদীয়া মাতার উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজার ব্যবস্থা করেন এবং এখনও সেইভাবে পূজা চলিযা আসিতেছে। তিনি কার্ত্তিকপূজা অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। পূজা উপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ-ভোজন হইত। শুনা যায, প্রায ১০০০ হাজার করিয়া ব্রাহ্মণেব সমাগম হইত। ইহার সময ব্রাহ্মণীনদীর তীরবর্ত্তী আউলিযা দেবেব মন্দির-নির্ম্মাণ ও নিত্যপূজার সুবন্দোবস্ত হয। তাঁহার সম্পত্তি সকল তাঁহাব বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও বিভিন্ন জেলায অবস্থিত ছিল। তাঁহার লাখেরাজ সম্পত্তিও অনেক আছে। বরলা যখন মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন ছিল সে সময় অনন্তবাবু মুর্শিদাবাদে লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিযা গভর্ণরের আদেশমত এক-কালীন নজর প্রদান করিযা নিজ জীবিত কালের মত ২টি বন্দুক ও ৪খানি তরবারি সমস্ত বৃটিশ রাজ্য মধ্যে যাইবার জন্য ফ্রি কবিয়া লইযাছিলেন। অনন্তবাবুর প্রধান গুণ ছিল—তিনি তাঁহাব প্রজাবর্গের মধ্যে শিক্ষিত ভদ্রলোকগণকে সদরে ও মফস্বলে চাকুরি দিয়া প্রতিপালন করিতেন। অনন্তবাবুর চারি পুত্র ও এক কন্যা—মুকুন্দলাল, মুরলীলাল, রঙ্গলাল, বিষ্ণুলাল এবং বিন্দুবাসিনী। ভবিষ্যতে তাঁহার বংশাবলীর তীর্থ-পর্য্যটনের কষ্ট দূর করিবার জন্য বৃন্দাবনধামে, কাশীধামে ও ভাগীরথী-তীরে খাগরা সহরে এই তিন স্থানে ৩টী বাড়ী খরিদ করেন। অনন্তবাবুর সময় হইতেই বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিনে বহু ব্রাহ্মণ-ভোজন

এবং ভোজনান্তে দক্ষিণা দিবার ব্যবস্থা হয়। তাঁহার মহাজনী ব্যাপারে কোন খাতকের টাকা বাকী পড়িলে আদালতের আশ্রয় না লইয়া কিস্তিবন্দী দ্বারা উক্ত টাকা আদায় করিবার ব্যবস্থা করিতেন। মফস্বল হইতে প্রজাবৃন্দ দরবারে আসিলে তাহাদিগের সরকার হইতে আহারাদির বন্দোবস্ত এখনও বিদ্যমান আছে। তাঁহার উপযুক্ত যথাযোগ্য সদ্‌গুণান্বিত পুত্র মুকুন্দলালের হস্তে তিনি সমস্ত বিষয়কার্য্যের ভার দিয়া বৈরাগ্যধর্ম্ম অবলম্বন করেন। অনন্তবাবু বৈরাগ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল উপযুক্ত পণ্ডিত দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতাদি-পাঠ শ্রবণ করিয়া যাপন করিতেন। ১২৯৩ সালে তিনি পুত্রগণ, ভ্রাতুষ্পুত্র, কন্যা, পৌত্র ও দৌহিত্র আদি রাখিয়া সমাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সমাধির পর তথায় একটী আখড়া স্থাপিত হয়। ঐ আখড়ায় শ্রীশ্রীগোপালদেবের সেবার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ১২৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ৫১ বৎসর বয়সে ১২৮৮ সালে একমাত্র পুত্র ভবেশচন্দ্রকে অনন্তবাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন।

মুকুন্দলাল ১২৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মুকুন্দলাল কোন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা করেন নাই। বাটীতে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বয়োবৃদ্ধি-সহকারে পিতার অনুগামী হইয়া বৈষয়িক কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করেন; পরে পিতৃপ্রদত্ত সম্পত্তির মালিক হইয়া সুন্দররূপে পিতার কীর্ত্তিসকল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জমিদারী পরিচালনা করিতে থাকেন। ইনি শীকারী ছিলেন এবং বন্দুকে তাঁহার অসাধারণ লক্ষ্য ছিল। মুকুন্দবাবু প্রায় ১৬ বৎসরকাল অতি যত্নের সহিত রামপুরহাট মহকুমায় অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। এই সময়ে রামপুরহাটে একটী বাটী নির্ম্মিত হয়। তাঁহারই সময় তাঁহার খুল্লতাত-

ভ্রাতা ভবেশবাবু পাঁচ আনার সরিক হইয়া ভূসম্পত্তি আদি পৃথকভাবে ১২৯৮ সালে বণ্টন করিয়া লন। মুকুন্দবাবু বিনয়ী, নম্র, দয়াদাক্ষিণ্য আদি বংশগতগুণে ভূষিত ছিলেন। মুকুন্দবাবু সিউরী হাঁসপাতালে মাসিক সাহায্যদানে অঙ্গীকৃত হইয়া তত্রত্য জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবগণের প্রীতিভাজন হন। দরিদ্রকে অন্নবস্ত্রদান, প্রতিবেশীকে ও কর্ম্মচারিবৃন্দকে অভাবের সময় সাহায্য করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ পাইতেন। মুকুন্দবাবুর একমাত্র পুত্র কমলকান্ত ও একটী কন্যাকে ভ্রাতাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া ১৩০৯ সালে পরলোক গমন করেন। অতি সমারোহের সহিত তাঁহার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়াছিল।

মুরারিলাল ১২৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার যত্নে শিক্ষা ও সৎসঙ্গ লাভ করিয়া ধনিগৃহে তিনি একটী উজ্জ্বল রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র দেবতুল্য ছিল, তাঁহার অমায়িকতা ও সৌজন্যদর্শনে লোকে এরূপ বিমুগ্ধ হইত যে, তিনি যে ধনীর সন্তান এবং স্বয়ং ধনবান লোকে তাহা ভুলিয়া যাইত। মুকুন্দবাবুর মৃত্যুর পর তিনি কুটিলতাময় সংসারে লিপ্ত না হইয়া সংসারের ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুলালবাবুর উপর অর্পণ করেন। তাঁহার বিনয়নম্র সহাস্যমূর্ত্তিখানি যেমন রমণীয় তাঁহার হৃদয়খানিও সেইরূপ মহৎ ছিল। কন্যাদায়ে, পিতৃমাতৃদায়ে কেহ উপস্থিত হইলে তিনি অর্থসাহায্য করিয়া তাহার আংশিক দায় উদ্ধার করিতেন। মুরারিবাবুর মত মিষ্টভাষী ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। ভ্রাতৃদ্বয় মধ্যে ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ বিশেষরূপে ছিল। তিনি অনেক মহাত্মা বৈষ্ণবের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র ভোলানাথকে রাখিয়া ১৩১২ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার আগুশ্রাদ্ধ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

রঙ্গলালবাবু ধার্ম্মিক ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। কেহ কখনও

অপর কর্ত্তৃক নির্য্যাতন-ভয়ে তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হইলে তিনি তাহাকে রক্ষার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। রঙ্গলালবাবুর জীবিতকালেই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুলালের মৃত্যু হয়। বিষ্ণুবাবুর মৃত্যুর পর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে লইয়া সমগ্র এষ্টেটের কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কমলাকান্তের মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে নিজের জমিদারী আদি ভাগ করিয়া লইয়া পৃথকভাবে বসবাস করিতেন। সন ১৩৬২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এক্ষণে তাঁহার স্ত্রী ভোলানাথবাবুর নিকট হইতে জীবনস্বত্বে স্বত্ববান হইয়া বাৎসরিক এক হাজার টাকা লাভের জমিদারী ও তালুকাদি ও জোত-জমি লইয়া পৃথকভাবে অবস্থান করিতেছেন।

বিষ্ণুলাল ১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুবাবু যদিও কোন উপাধিধারী ছিলেন না, তথাপি তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, সৌজন্য, ও সহৃদয়তাগুণে তিনি কনিষ্ঠ হইয়াও জমিদারী যশের সহিত পরিচালনা করিতেন। তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছিলেন; তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। আশ্রিত-পালন তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম ছিল। তিনি নিজের সৌজন্য ও প্রশান্তচিত্ততার প্রভাবে তাঁহার প্রজাবর্গের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ উদারচেতা ছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যের প্রজা ও অপর সাধারণ ব্যক্তি তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। তিনি বহুদিন যাবৎ রামপুরহাট মহকুমার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং তৎকালে প্রায়ই বড় বড় জটিল মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য তিনি আদালত হইতে সালীশ নিযুক্ত হইতেন। বিষ্ণুবাবু নিরভিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সহিত কাহারও মতভেদ ঘটিলে তিনি তাহার জন্য কোন তর্ক না করিয়া ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া যাহা সৎ তাহাই করিতেন। তিনি শীতকালে

সাধ্যমত অনেক দরিদ্র নরনারী, খঞ্জ ও আতুরকে বস্ত্রদান করিতেন। তিনি ৫১ বৎসর বয়সে ১৩২০ সালে ক্যানসার রোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ যথাবিহিতভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। সন ১৩২২ সাল হইতে এই জমিদার-বংশ মণ্ডল পরিবর্ত্তে সমাজ হইতে রায়চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে ইহারা রায়চৌধুরী উপাধিতেই খ্যাত।

কমলকান্ত ১২৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাটীতে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ভ্রাতৃস্নেহ অতিশয় প্রবল ছিল। তিনি খুল্লতাত ভ্রাতা ভোলানাথকে লইয়া একসঙ্গে স্নান, আহার ও ভ্রমণ করিতেন। প্রধান কথা—তিনি ভোলানাথকে প্রায় সঙ্গ ছাড়া করিতেন না। কমল-বাবু শৈশব হইতেই বিনয়ী, নম্র, দয়ালু, মিষ্টভাষী, শম ও দম-গুণান্বিত ছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল এবং তিনি একজন প্রসিদ্ধ পাখোয়াজ-(মৃদঙ্গ) বাদক ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন। সঙ্গীত-বিদ্যায় তাঁহার অনুরাগ থাকায় তিনি অল্প বয়সেই ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিলেন। সন ১৩০৪ সালে তাঁহার একটি পুত্র হয়। পুত্রের নাম শরৎচন্দ্র রাখা হয়। শরৎচন্দ্র অল্প বয়সেই পিতামাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দেহত্যাগ করেন। এই সময় হইতেই তিনি সাংসারিক কার্য্যে একেবারেই নির্লিপ্ত হন। তাঁহার এবংরূপ নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রথম স্ত্রী তাঁহাকে পুনরায় দার পরিগ্রহ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন এবং তাঁহার অনুরোধক্রমে কমলবাবু দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পুত্রের নাম মনোজমোহন ও কন্যার নাম পার্ব্বতীবালা। ১৩৩০ সালের কার্ত্তিক মাসে তিনি নাবালক মনোজমোহনকে রাখিয়া দেহত্যাগ করেন।

ভোলানাথ ১২৯১ সালের ২২শে কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তি-সহকারে বাটীতেই উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। এই শিক্ষালাভের সময়েই তাঁহার হৃদয়ে অনেক সদ্ভাবের উদ্ভব হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই পারিবারিক কর্ত্তব্যের দায়িত্ববুদ্ধি তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হয়। ভোলানাথবাবু পরোপকারী, বিনয়ী ও নম্র। ভোলানাথবাবু কৈশোর অতিক্রম করিয়াই খুল্লতাত বিষ্ণুবাবুর নিকট বৈষয়িক কার্য্য শিক্ষা করেন। কমলকান্তবাবুর মৃত্যুর পর এত বড় বিস্তৃত জমিদারী ও পারিবারিক সমস্ত ভার একাকী তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইযাছিল। তিনি আত্মীয়-স্বজন ও অধীন কর্ম্মচারিবৃন্দের দুঃখ-দূরীকরণার্থ সাধ্যমত আংশিকভাবে সাহায্য করিয়া সকলকেই মিষ্টকথায় সন্তুষ্ট রাখেন। তিনি রামপুরহাট টাউন হল নির্ম্মাণকালে সম্প্রতি ৫০০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভোলানাথবাবুই জমিদারী পরিচালনা করিতেছেন। তিনি প্রজারঞ্জক জমিদার। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের গরীব-দুঃখীগণের চিকিৎসার জন্য নিজ ব্যয়ে গ্রামে একজন সুযোগ্য ডাক্তার রাখিয়াছেন। তিনি নিজে বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে চলনী নদীর মূল কোশিয়া নালায় একটী ক্যানেল খনন করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদিও গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ইহার সমস্ত ব্যয় বর্ত্তমানে বহন করিতেছেন, কিন্তু ভোলানাথবাবুর চেষ্টায় ও যত্নে ইহা সম্পন্ন হইতেছে। ইহাতে প্রায় দশ হাজার বিঘা জমি সেচ হইবে। তিনি প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ বরলা ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের কার্য্য বিশেষ প্রশংসার সহিত করিয়া আসিতেছেন। নিজে খরচের অধিকাংশ পরিমাণ টাকা চাঁদা দিয়া বরলাগ্রামে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে নিজের খরচে এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয়-স্থাপনের চেষ্টায় আছেন।

শ্রীযুক্ত ভোলা নাথ রায় চৌধুরী

মনোজমোহন ১৩২৫ সালের কার্ত্তিকমাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই এক্ষণে বরলা জমিদার-বংশের একমাত্র বংশধর। তাঁহার বয়স মাত্র ১১ বৎসর। তিনি এক্ষণে পারিবারিক শিক্ষকের অধীনে থাকিয়া নলহটী হাই স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন।

ডাঃ জলধর মণ্ডল, এল্-এম্-এস্

ভক্তিবিনোদ

চব্বিশপরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমায় আড়বালিয়া একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এই গ্রামে বাঙ্গালা ১২৮১ সালের ফাল্গুনমাসে স্বর্গীয় ডাক্তার জলধর মণ্ডল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম প্রাণনাথ মণ্ডল। যখন জলধরবাবু জন্মগ্রহণ করেন তখন ভাগ্যবিপর্য্যয়ে স্বর্গীয় প্রাণনাথ মণ্ডল মহাশয়ের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। তাই শৈশবের কয়েক বৎসর ব্যতীত তিনি তাঁহার জন্মভূমিতে অবস্থান করিতে পারেন নাই। ধান্যকুড়িয়াতেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ভাগ অতিবাহিত হইয়াছিল এবং পরে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া এইখানেরই স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছিলেন।

জলধরবাবু নিরতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দৈন্য এবং অভাব তাঁহার অগ্রগতিকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে কিন্তু তিনি ভাগ্যের সহিত প্রবল যুদ্ধ করিয়া অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে এবং অদ্ভুত মনীষাবলে জীবনে এত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাই পার্শ্বস্থ গ্রাম নদীয়ার ৺গণেশচন্দ্র মণ্ডল, ৺দুর্গাচরণ মণ্ডল, ধান্যকুড়িয়ার প্রসিদ্ধ দানবীর ৺শ্যামাচরণ বল্লভ ও ৺রায় উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুর প্রভৃতি সদাশয় ব্যক্তিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই সাহায্যেই তাঁহার উচ্চশিক্ষা সম্ভব হইয়াছিল। যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন ততদিন কৃতজ্ঞতার সহিত ইঁহাদিগের পরম উপকার স্মরণ করিতেন। শৈশব

স্বর্গীয় ডাক্তার জলধর মণ্ডল এল্, এম, এস, ভক্তিবিনোদ।

হইতেই তিনি তাহার অসাধারণ ধীশক্তির জন্য প্রশংসিত হইতেন। নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্যবাঙ্গালা পরীক্ষায় তিনি উচ্চ বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং এনট্রান্স পরীক্ষায় ধান্যকুড়িয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। পরে ডাফ্ কলেজ হইতে এফ্-এ পাশ করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সসম্মানে এল্-এম্-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সুবিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। ছাত্রজীবনে ইঁহারা সকলেই কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই তিনি এক মহা-সমস্যায় নিপতিত হইলেন। এ সমস্যা চাকুরীর অভাবের জন্য নহে কারণ,—তখনও চাকুরীর বাজার এত মন্দ হয় নাই। বিশেষতঃ চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্মান ছিল। তিনি নানাস্থান হইতে উচ্চ বেতনের চাকুরীর অঙ্গীকার পাইলেন বটে কিন্তু সহসা কোন স্থানে আত্মনিয়োগ করিলেন না। যখন তিনি তাঁহার স্বীয় জীবনের আদর্শের কথা ভালরূপে ভাবিতে লাগিলেন তখন জন্মভূমি এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পল্লীগ্রামগুলির সুচিকিৎসকের অভাবের জন্য শোচনীয় দুরবস্থা তাঁহার প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি এই অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন এবং বিশেষতঃ দরিদ্রগণের অসামর্থ্য তাঁহার প্রাণে গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। তাই তিনি স্থির করিলেন যে, জগদীশ্বর যখন তাঁহাকে চিকিৎসক হইবার সুযোগ দিয়াছেন তখন পল্লীগ্রামেই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিবেন। এই সময়ে তাঁহার প্রাণের আশা ফলবতী হইবার সুযোগ ঘটিল। স্বর্গীয় রায় উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত "শ্যামাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়ে" তিনি চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য আহূত

হইলেন। তিনি বেতনের অল্পতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে প্রায় ২৫ পঁচিশ বৎসরকাল এই সেবাব্রতে ব্রতী ছিলেন। পাড়াগাঁয়ে যেখানে পথ-ঘাট ভাল নাই, বর্ষা আরম্ভ না হইতেই চারিদিক্ দুর্গম হইয়া পড়ে, অথচ সেখানে তিনি সামান্য দর্শনীমাত্র লইয়া চিকিৎসার জন্য বাহির হইতে ইতস্ততঃ করিতেন না। দুর্গম স্থানে এবং দরিদ্রের নিকট যাইতে তাহার সমধিক উৎসাহ লক্ষিত হইত। অনেক সময় তিনি দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে পারিশ্রমিকই লইতেন না। দরিদ্রনারায়ণ-সেবার যে আনন্দ সেই আনন্দই তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখিত। এইজন্য তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই, কিন্তু অতুল আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—সুচিকিৎসার জন্য বিমল যশঃ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অর্থার্জ্জন কোন কালেই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল না। উচ্চ বেতনের চাকুরী গ্রহণ না করিয়াও তিনি চেষ্টা করিলে কলিকাতায় বা অন্য কোন সমৃদ্ধ স্থানে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। তিনি চিকিৎসাক্ষেত্রে যেরূপ যশোলাভ করিয়াছিলেন তাহাতে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য কেবল যে বসিরহাট মহাকুমায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল এমন নহে, অন্যান্য মহকুমায় তাঁহার চিকিৎসার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং অন্যান্য স্থানে কঠিন পীড়ার চিকিৎসার জন্য তিনি সগৌরবে আহূত হইতেন। তাঁহার চিকিৎসার যশঃ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াই চলিয়াছিল এবং অকালে যদি তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান না করিতেন, তাহা হইলে দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেন।

এই স্বনামধন্য মহাপ্রাণ কেবল দেশ ও জাতি-হিতৈষী ছিলেন না, তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহাকে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিল। ধর্ম্মকে

শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জিউর মন্দির—ধান্যকুড়িয়া।
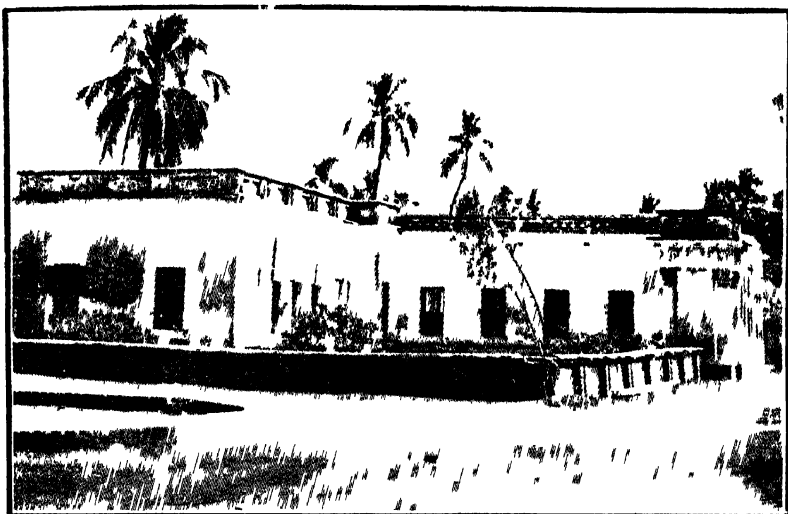
শ্যামাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়—ধান্যকুড়িয়া।

তিনি হৃদয়ের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়াই তিনি শান্তি পাইতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও জড়বাদ (materialism) তাঁহাকে কোনকালে অভিভূত করিতে পারে নাই অথবা নীরস অধ্যাত্মবাদকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি প্রেমিক এবং ভক্তি-পথের পথিক ছিলেন।

জলধরবাবুকে কেবল অভিজ্ঞ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বলিলে তাঁহার আংশিক পরিচয় দেওয়াও হয় না। তিনি জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য যে পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহার আদর্শ স্থিরীকৃত হয় না। তাহার হৃদয় ভাবে ভরপূর থাকিত; তাঁহার বৈষ্ণবীয় দৈন্যে সকলে মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। তাঁহার কোমল হৃদযে বৈষ্ণবধর্ম্ম অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহার কীর্ত্তন যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা কখন মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। যখন তিনি পদকীর্ত্তন গাহিতেন তখন মনে হইত—তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া গাহিতেছেন। সঙ্গীতের স্রোতঃ যেমন তাঁহার অন্তঃস্থল হইতে বাহির হইত তেমনি শ্রোতৃ-বৃন্দের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিত। তিনি বাহির দুয়ারে কপাট দিয়া গাহিতেন। তাই তৎকালীন সেই আত্মহারা আননে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবের ছায়া পড়িত। তিনি গভীর সাধক, তত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্রদর্শী বৈষ্ণব পণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁহার বিপুল জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া নবদ্বীপ বিদ্বৎ-সমাজ তাহাকে ভক্তিবিনোদ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

তিনি মনে প্রাণে এবং কার্য্যে বৈষ্ণব ছিলেন। অশিক্ষিত অজ্ঞ লোকদিগকে ধর্ম্ম এবং সৎকথা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিতেন এবং তাহাদের তাপ-দগ্ধ হৃদয়ে সর্ব্বদা শান্তিবারি-সেচনে প্রয়াসী থাকিতেন। কীর্ত্তনে তাঁহার এরূপ আসক্তি ছিল যে, যেখান হইতেই হউক না কেন, কীর্ত্তন গাহিবার জন্য আহূত হইলে তিনি সেইখানেই যাইতেন, এ বিষয়ে তাঁহাকে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতে দেখা

যাইত না এবং তিনি কোন বিভেদও মানিতেন না। তাই তিনি গ্রামে গ্রামে কীর্ত্তন, নাম-গানের উপদেশ দ্বারা অনেক লোককে বৈষ্ণব মতে ও পথে আনিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি ধান্যকুড়িয়ায় শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তের মন্দিরে ভক্ত-মণ্ডলী লইযা 'সাধন-চক্র' রচনা করেন। এই 'রণচক্রে' বহুদূর হইতে ভক্ত-মধুপের সমাগত হইত। ঐ মন্দিরে ভাগবত সভা স্থাপন করিয়া ধর্ম্মালোচনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনে, 'ভক্ত-নির্য্যাতন' নামক প্রবন্ধে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল ঃ—

* * * "ডাক্তার জলধর মণ্ডল আমাদের পরম স্নেহের অমূল্যধন। আমরা সেই অমূল্যধন-হারা হইয়া দীনাতিদীন হইয়া পড়িলাম। ধান্য কুড়িয়ায় যাইয়া আমরা শ্রীবৃন্দাবনীয় আনন্দ উপভোগ করিতাম * * * তাঁহার সহজ সৌম্য সুমধুর আকারে, সুধামধুর ভাষায়, ভক্তোচিত চিত্তাকর্ষি-সবিনয় ব্যবহারে, সর্ব্বোপরি তাহার শ্রীনাম কীর্ত্তন ও রসকীর্ত্তনের গোলক-বৈভবরূপ কলতানে আমরা প্রেমানন্দে বিমুগ্ধ হইতাম। * * * তিনি তাঁহার স্বগ্রামবাসিগণের রোগশয্যার বন্ধু ছিলেন না, তিনি কেবল তাহাদিগের দৈহিক রোগের চিকিৎসক ছিলেন না—তিনি ভক্তি-কথায় তাহাদের হৃদয়ে গোলকরসের রসায়ন সঞ্চারিত করিতেন, তাহাদের হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত করিতেন, হরিকথা ও হরিনামে তাহাদের দুর্জ্জয় ভবরোগ খণ্ডনের মহাসহায় ছিলেন। গ্রামবাসীর প্রত্যেক সদানুষ্ঠানে যোগ দিয়া সকল কার্য্যের সাফল্য সম্পাদন করিতেন, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলের ঘরেই তিনি পরোপকারময় হস্ত প্রসারিত করিয়া সকলেরই সর্ব্ববিধ সাহায্যে সর্ব্বদাই ব্রতী হইতেন। * * * রোগীর শয্যাপার্শ্বে প্রীতি-প্রফুল্ল-বদনে উপস্থিত হওয়ামাত্র তাঁহাকে দেখিয়াই রোগার রোগযাতনার অর্দ্ধমাত্রা তৎক্ষণাৎ

প্রশমিত হইত। তাঁহার মুখমণ্ডলে দয়াময় শ্রীভগবান্ প্রীতি-প্রফুল্লতা স্বাভাবিক-ভাবে মাখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় এইভাবের পূর্ণতম নিত্য উৎস ছিল—সেই অফুরন্ত উৎস হইতে তাঁহার মুখমণ্ডলে অনুক্ষণ প্রীতি-প্রফুল্লতা সঞ্চারিত হইত—সে মুখমণ্ডলে আমরা কখন ক্রোধ, অভিমান, অজ্ঞতার দর্প, অসৌজন্য বা বিদ্বেষের ভাব দেখিতে পাই নাই। * * * তাঁহার প্রেমভক্তির প্রভাব সর্ব্বদাই তাঁহাকে সাধু-বৈষ্ণব-সমাজে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিত– তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ দীনতায় নিজেকে অতি হেয় দেখাইতেন তদ্রূপ তৃণাদপি নীচভাব প্রদর্শন করিতেন কিন্তু আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সখার ন্যায় বুকে জড়াইয়া ধরিতাম— তিনি ভক্তিবিনম্রচিত্তে দূরে দূরে থাকিতে চাহিলেও আমরা স্বভাবতঃ চুম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অতি নিকটে যাইয়া বসিতাম, এমন একটী স্বাভাবিকী আকর্ষণ-শক্তি শ্রীভগবান্ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন।”

এইবার তাঁহার সাংসারিক জীবন-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র কেবল চিকিৎসা-ব্যবসায়ে সীমা-বদ্ধ ছিল না, অবসর পাইলে তিনি সাধারণের হিতকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া ধান্যকুড়িয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের তত্ত্বাবধান করিয়াই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যের সমাপন করিতেন না, নিজে অবসরমত স্কুলে গিয়া পড়াইতেন। দরিদ্র ছাত্রদের প্রতি তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল এবং তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

তিনি বাদুড়িয়া বেঞ্চ কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি তাঁহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার সুবিচার এবং সুবিবেচনার জন্য অনেকেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিত।

তাঁহার পরলোকগমনে বসিরহাট মহকুমার মুখপত্র 'বসিরহাট-হিতৈষী তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"* * * স্বনামধন্য, দেশ ও জাতি-হিতৈষী, মহাপ্রাণ, স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ বলিয়া স্বর্গীয় ডাক্তার জলধর মণ্ডল মহানুভবের অশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহার সত্য-নিষ্ঠা, সরলতা, ধর্ম্মপ্রিয়তা, সুহৃদ্‌রঞ্জন ভাব সকলকে সর্ব্বক্ষণই মুগ্ধ করিত। ধান্যকুড়িয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া একাল পর্য্যন্ত উহার অশেষ উন্নতি-সাধন করার মূলই স্বর্গীয় ডাক্তার জলধর। কি রোগনির্ণয়, কি শস্ত্র-চিকিৎসা এই দুই বিষয়ে তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। দরিদ্রনারায়ণ-সেবায় তিনি মুক্তহস্ত ও মুক্তহৃদয় ছিলেন। তাঁহার গোপন দান অনেক ছিল। স্বর্গের যে অম্লান পুষ্পটী মর্ত্ত্যে বিকসিত হইয়া সুহাসে, সুবাসে দশ দিশ্‌ বিভোর করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে কালের করাল স্পর্শে কোথায় লুকাইল।"

প্রকৃত কথা বলিতে কি, তাঁহার যশঃ কেবল বসিরহাট মহাকুমায় সীমাবদ্ধ ছিল না, চিকিৎসা-নৈপুণ্যের জন্য তিনি বহুস্থান হইতে আহূত হইতেন। তাঁহার ইহলোক পরিত্যাগের পর বঙ্গীয় চিকিৎসক সমাজের মুখপত্র 'স্বাস্থ্যে' প্রকাশিত তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

"* * * সুচিকিৎসায় তাঁহার যশঃ বহুদুর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কঠিন দুরারোগ্য পীড়ার চিকিৎসার জন্য, অতি দূরদেশ হইতে তিনি সবহুমানে আহূত হইতেন। তিনি রোগীর বাড়ী আসিলে, রোগী ও তাহার অভিভাবকের মনে হইত রোগীর অর্দ্ধেক রোগ কমিয়া গেল। রোগীর প্রতি তাঁহার দয়া ও সহানুভূতি চিকিৎসকমাত্রেরই অনুকরণযোগ্য।"

তিনি অসময়ে ইহধাম হইতে প্রস্থান করিলেন, তাহা না হইলে, দেশের ও দশের আরও অনেক উপকার করিতে পারিতেন। তিনি ১৩৩৫ সালের ২৪শে শ্রাবণ বরাহনগরে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৪ বৎসর হইয়াছিল।

রায় শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, এম-এ, বি-এল,

(অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্স জজ)

বংশ-তালিকা
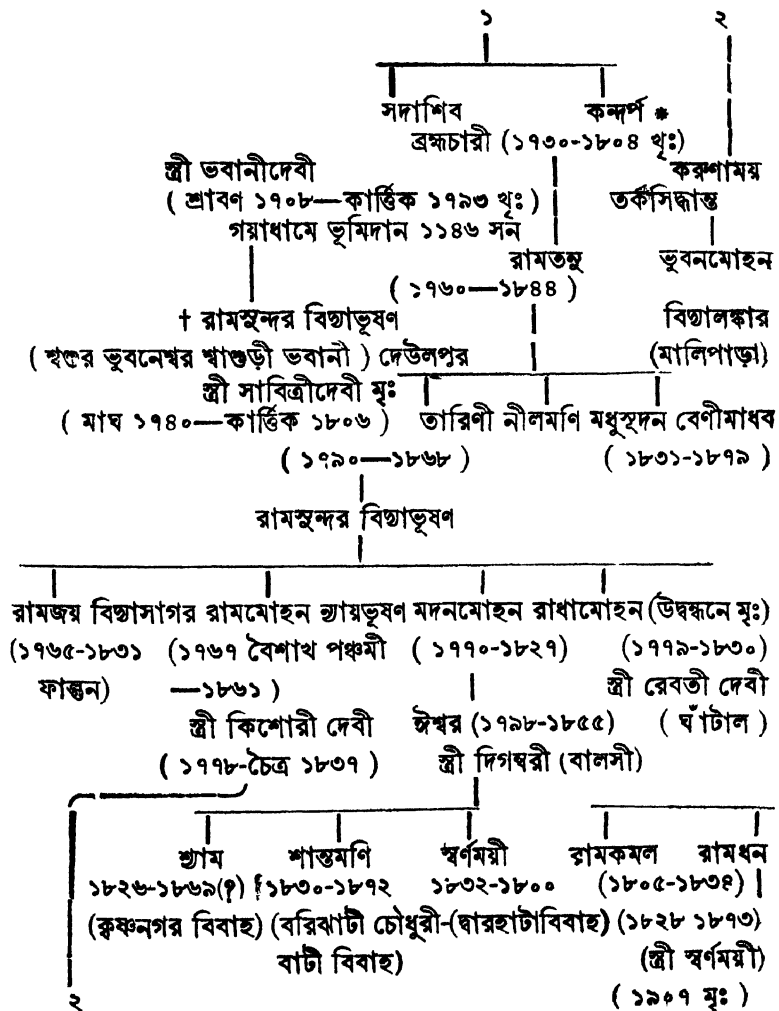
* সদাশিব এবং কন্দর্পের মধ্যে বিভাগ (বাং ১১৬৭ সন) ; কন্দর্প পুনরায় বিবাদ করেন, মীমাংসা (বাং ১১৭৪) ।

† রামসুন্দরের শ্যালকের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী সহমৃতা হন (১৭৯০ খৃঃ) ।

২

গোপীনাথ ন্যায়ালঙ্কার (১৭৯৫-শ্রাবণ ১৮৭৯) স্ত্রী নীলমণি জগদম্বা দেবী (১৮০২-৬৭) (রামকিশোর মুখোর কন্যা—বলুণ্ডী)

ব্রহ্মময়ী (বিবাহ আলা ধনিয়াখালী) মুখো ১৭৯৮-১৮৪২?

রঘুমণি * বিবাহ কলুবাটী (পীতাম্বর চট্ট স্বকৃতভঙ্গ) (১৮০০-৭২)

রামেশ্বর ১৮০২-১৩ মাঘ ১৮৪০ খৃঃ স্ত্রী জগদম্বা দেবী (কৈকালা) (১৮১২-৭১)

রাসমণি (বিবাহ কৈকালা প্রতাপনারায়ণ মুখো ১৮০৫)

গোপীনাথের সন্তান:

কাশীনাথ ১৮২০-৩৪

ক্ষেমঙ্করী ১৮৪২-মার্চ্চ ১৮৮৩ (বংশহীনা)

থাকমণি ১৮৪৭-৭৯ পৌষ — কুসুমকুমারী ১৮৬৩-৯৩ (নিরুদ্দেশ)

রাসমণির সন্তান:

মঙ্গলা (বিবাহ—আলা কালিদাস চট্ট) ১৮০৮ (বংশহীনা)

রামেশ্বরের সন্তান:

সুখময়ী দেবী (বিবাহ ঝাপড়দহ দিননাথ মুখো) ১৮৩০-১৮৬৪ — বামাচরণ (ওরফে মেনো) ১৮৫০ মাতা ব্রহ্মময়ী

গোপালচন্দ্র (১৮৩৬-১৯০৯) স্ত্রী কালিদেবী ১৮৪১ (রাজচন্দ্র তর্কবাগীশের কন্যা)

গোপালচন্দ্রের সন্তান:

গিরিশচন্দ্র বৈশাখ ১৮৬০-কার্ত্তিক ১৮৯৫

রায় পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর স্ত্রী প্রভাবতী দেবী(১) আষাঢ় ১৮৬২ (২)

ভবানী (ওরফে ভুবনেশ্বরী (১৮৬৪ আষাঢ়-বৈশাখ ১৮৯৫)

কন্যা (মৃত)

৩পুত্র (গর্ভেই মৃত)

২

---

* রঘুমণির ২ কন্যা—নবকুমারী ও স্বর্ণময়ী। নবকুমারীর স্বামী ৺রামদাস বন্দ্যোঃ বাবাণ্ডা 'মিষ্টার W. C. Banarjee's (মৃত্যু ১৮৯৩, ভাদ্র) কন্যা গৌরী (মৃত ১৯২৩) স্বর্ণময়ী (মৃত ১৮৯৮-চৈত্র; বংশহীন)।

(১) ইনি অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা এবং হাইকোর্টের জজ অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী—পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।

(২) ইহার স্ত্রী বসন্তকুমারী দেবী, ইনি লাহোরের রায় শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের কন্যা; জন্ম ১৮৭১, মৃত্যু ১৯২৪ কার্ত্তিক।

২

সুরেশচন্দ্র	২পুত্র	তিনকড়ি	কামাখ্যা
আগষ্ট ১৮৭৩	(মৃত)	আশ্বিন ১৮৮০ (খ)	জন্ম ১৮৮২ বিবাহ১৮৯৪মাঘ
কার্ত্তিক, ১৯২৮ (ক)			(স্বামী খিদিরপুরের ৺ভগবতী চট্টর পুত্র আশুনাথ)

গিরিশচন্দ্রের ৪ পুত্র—শিবচন্দ্র (মৃত), সতীশ (জন্ম ১৮৯০ খৃঃ), সুধীর (জন্ম ১৮৯১), সুশীল (জন্ম নভেম্বর ১৮৯২), ৪ কন্যা—ননীবালা (জন্ম ১৮৮২ মৃত্যু ১৯০৬), সুশীলা (জন্ম ১৮৮৬ মৃত্যু ১৯০২) শৈলবালা (ওরফে গুণী জন্ম ১৮৮৪), সরলা (জন্ম ১৮৯৫)

সতীশের শ্বশুর শেওড়াফুলীর ৺জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়। সুধীরের শ্বশুর শিবপুরের বাবু বিনোদবিহারী হালদার। সুশীলের শ্বশুরবাড়ী আগড়পাড়ায়।

ননীবালার স্বামী শেয়াখালার ৺চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ৺মন্মথ নাথ। শৈলবালার স্বামী দত্তপুকুরের ৺কালীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ৺সুশীলচন্দ্র। সুশীলার স্বামী আমতার ৺তিনকড়ি চট্টোর পুত্র ৺বিপিন-চন্দ্র। সরলার স্বামী শেয়াখালার ৺মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বিবাহ হয় ১৯০৭ খৃঃ অব্দে।

পরেশচন্দ্রের ৩ পুত্র—ফণীন্দ্রভূষণ (জন্ম ১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৬), মণীন্দ্র (জন্ম ১৮৯২ মৃত্যু ৯ মে ১৯০২) বিভূতিভূষণ (জন্ম ৩১ ডিসেম্বর, ১৯০৫) ৯ কন্যা—ঊষাপ্রভা (জন্ম ১৯ জুলাই ১৮৮৯), স্বর্ণপ্রভা (জন্ম ৯ জানুয়ারী ১৮৯২, মৃত্যু বৈশাখ ১৯০৫), নির্ম্মলা (জন্ম ১৪ আষাঢ় ১৮৯৩), সরযূবালা (জন্ম ৩ অক্টোবর ১৮৯৫), মনোরমা (জন্ম

(ক) ইনি আগড়পাড়ার পার্ব্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীকে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে বিবাহ করেন।

(খ) ইনি বেলঘরিয়ার ৺ নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী, কালিঘাটের ৺ বিনোদনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা প্রভাবতী দেবীকে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিবাহ করেন।

২৯ এপ্রেল ১৮৯৮), অনুপমা (জন্ম আষাঢ় ১৯০৩), নিরুপমা (জন্ম ২ ফাগুন ১৯০৮), সুষমা (জন্ম পৌষ, ১৯১২) এবং সুরমা (আশ্বিন ১৯১৪)।

ঊষার বিবাহ ২৬ বৈশাখ ১৯০১, স্বামী ধোবাপাড়ার ভগবতী গঙ্গোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্র ৺গঙ্গাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র হারামণি গঙ্গো। আমাটের গাঙ্গুলী।

স্বর্ণপ্রভার স্বামী চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, কালীঘাটের ৺প্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র, নীলমণি মুখোপাধ্যায়। বিবাহ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৯০৩। কামদেব পণ্ডিতের সন্তান। ৫ পুরুষ।

নির্ম্মলার বিবাহ ৪ বৈশাখ ১৯০৫। স্বামী পাকুড়ের ৺কান্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নন্দলাল। কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, ৫ পুরুষ।

সরযূবালার বিবাহ বৈশাখ ১৯০৭। স্বামী ভ্যাবলার ৺চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির ভ্রাতুষ্পুত্র ননীলাল মুখোপাধ্যায়। যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান।

মনোরমার বিবাহ জুন ১৯০৯। স্বামী ভাগলপুরের ৺অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ, আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন। পূর্ব্বনিবাস হালিসহর।

অনুপমার বিবাহ জ্যৈষ্ঠ ১৯১৫। স্বামী বাঁশবেড়িয়ার ৺জ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বিবজাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ইহার পিতামহ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠী।

নিরুপমার বিবাহ (ওরফে রাণুর) ফাল্গুন ১৯১৯। স্বামী নবদ্বীপের ৺রামদাস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ৺জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়। ইহার পিতামহ ডেপুটী ইন্‌সপেক্টর ছিলেন, পিতা ডাক্তার ছিলেন।

সুষমার বিবাহ ফাল্গুন ১৯২৩। স্বামী টীটাগড়ের বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

সুরমার বিবাহ মাঘ ১৯২৬। স্বামী বৈঁচির জমিদার ৺রামলাল মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র, বাবু মৃত্যুঞ্জয় মুখোর পুত্র, বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় (হাল সাং কাশীধাম)।

ফণীন্দ্রভূষণ কলিকাতার ছোট আদালতের উকিল, বিবাহ বৈশাখ ১৯০৭। শ্বশুর—শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া (তমলুকের উকিল); ইনি এম-এল-সি ছিলেন।

বিভূতিভূষণের বিবাহ ফাল্গুন ১৯২৮; শ্বশুর বাবু বিজয়গোপাল চক্রবর্ত্তী বি-এ, ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ রায় দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের পুত্র।

সুরেশচন্দ্রের ৪ পুত্র—সুবোধচন্দ্র, সমরেন্দ্র ওরফে পটল, শঙ্করনারায়ণ ও বদরিনারায়ণ এবং ৬ কন্যা—বীণাপাণি, স্বামী কুড়ালগাছির জমীদার বাবু নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী; কমলা, স্বামী গোপীনাথপুরের কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়; ষোড়শী, স্বামী উত্তরপাড়ার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন; ভৈরবী, স্বামী রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ভাণ্ডারহাটী); ত্রিপুরা, স্বামী ইলিপুরের বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মনোমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমরেন্দ্রের বিবাহ আষাঢ় ১৯২৬—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী এবং সবজজ বাবু বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্রীর সহিত। বিপিনবাবু কাঁঠালপাড়ানিবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺পূর্ণচন্দ্রের পুত্র এবং ৺রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র।

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৬ পুত্র—ফকিরচন্দ্র, দুর্গাচরণ, লক্ষ্মীচরণ, চণ্ডীচরণ, কামাখ্যাচরণ, এবং ভবানীচরণ। এক কন্যা আশালতা, স্বামী ভদ্রেশ্বরের বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনকড়ির শ্বশুর ৺বিনোদনাথ খোপাধ্যায়।

ভবানী ওরফে ভুবনেশ্বরীর স্বামী ৺ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ; হাল সাং কালীঘাট, পূর্ব্বনিবাস কোন্-নগর, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান ৪ পুরুষ। তাঁহার ২ পুত্র কালিদাস (জন্ম কার্ত্তিক ১৮৮০) ও রামচন্দ্র (শ্রাবণ ১৮৮৫) ; ৪ কন্যা– গৌরী (চৈত্র ১৮৮২ মৃত্যু ১৯০৮) ১৮৯৪ বিবাহ, গোঁদলপাড়া, স্বামী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; রাধারাণী (জন্ম চৈত্র ১৮৮৪) বিবাহ ১৮৯৬, ভাগলপুর ৺অঘোরনাথ গাঙ্গুলীর পুত্র ৺মণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সহিত ; শরৎকুমারী (জন্ম ফাল্গুন ১৮৮৯), বিবাহ জ্যৈষ্ঠ ১৯০১, জৌগ্রামের ৺দুর্গাগতি চট্টো-পাধ্যায়ের সহিত (মৃত্যু ভাদ্র ১৯০৩) ; সিদ্ধেশ্বরী (জন্ম জুন ১৮৯১), বিবাহ ১৯০৩, ভাজনঘাট-নিবাসী বাবু অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র নন্দলালের সহিত।

রায় শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের (মৃত্যু জুলাই ১৯০১) ৩ পুত্র—মন্মথনাথ (জন্ম ১৮৭৮—মৃত্যু ১৯২৬), বিবাহ কলিকাতা-নিবাসী আর্টিষ্ট ৺প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত, লাহোর চিফ কোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন—২ পুত্র শুকদেব এবং মহাদেব এবং এক কন্যা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

প্রমথনাথ (জন্ম ১৮৮০) কলিকাতার একজন খ্যাতনামা ডাক্তার, বিবাহ ১৯০৩ টালানিবাসী ৺মধুসূদন চট্টোর পৌত্রী, শক্তিচরণ চট্টো-পাধ্যায়ের কন্যা—দুই পুত্র এবং দুই কন্যা—বসুদেব (জন্ম ১৯০০) বিবাহ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মহাদেব পুরগ্রাম-নিবাসী বাবু ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় ডাক্তারের কন্যা—এক পুত্র এবং এক কন্যা—প্রফেসর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ। রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা বসন্তকুমারী, স্বামী পরেশচন্দ্র ; দ্বিতীয়া কন্যা শরৎকুমারী, স্বামী বরিঝাটী-নিবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত) ; তৃতীয়া কন্যা ফুলকুমারী,স্বামী লাহোর চিফ কোর্টের জজ ৺রায় প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাহাদুর C. I. E. র জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার বিপিনচন্দ্র চাটার্জ্জি ; কনিষ্ঠা কন্যা চারুবালা, স্বামী উত্তরপাড়া এবং গয়ানিবাসী ৺নীলমণি গাঙ্গুলীর পুত্র (বিবাহ ১৮৯৭, বৈধব্য ১৮৯৮)।

রায় বাহাদুরের স্ত্রীর মৃত্যু এপ্রেল ১৯০৯।

এই বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত গোশা গ্রাম। এই গ্রাম হরিপালের সন্নিহিত, হরিপাল ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দক্ষিণে। হরিপাল এবং গোশার মধ্যে শীর্ণকলেবরা কৌশিকী নদী। হরিপাল একটী অতি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। রাজা হরিপালের নামানুসারে এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। রাজা হরিপালের নাম "ধর্ম্মমঙ্গল" গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনুমান খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই রাজ্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। সম্ভবতঃ এই রাজগণ সদ্গোপ-বংশীয় ছিলেন।

হরিপাল পূর্ব্বে ফুলিয়া মেলের একটী প্রধান স্থান ছিল। ভবানী রায় (মুখোপাধ্যায়) এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। সুষেণ পণ্ডিত চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পুত্র ভবানী রায়। ইনি কানাই ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ এবং শিবাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র, মথুরেশের পুত্র, রাম রায় এই ভবানী রায় বংশের কোন ব্যক্তির কন্যার পাণিপীড়ন করেন ; এই জন্য তিনি রামরাম রায় বা রাম রায় নামেও অভিহিত হইতেন। তাঁহার পুত্র কানুরাম বাচস্পতি এবং পরশুরাম হরিপাল মালিপাড়ায় বাসস্থাপন করেন। কানুরাম (ওরফে রামকানাই) বাচস্পতি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং তান্ত্রিকতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। হরিপালের ন্যায় বহুজনপূর্ণ গ্রাম সাধনার উপযোগী নহে, এই জন্য তিনি গোশা গ্রামে আসিয়া কৌশিকী নদীতটে বাস-বাটী নির্ম্মাণ করেন। ঐ বাটীর সন্নিকটে পঞ্চমুণ্ডীর উপর ৺ত্রিপুরাসুন্দরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং এক শিবলিঙ্গ স্থাপন

করেন। তিনি যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক কারুকার্য্য ছিল তাহা ১৮৯০ কি ১৮৯১ সালে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। শিবলিঙ্গটীও ভগ্ন হয়। পরে ১৯০৩ সালে ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে দেবী এক্ষণে বিরাজমানা। একটী নূতন শিবলিঙ্গও তথায় স্থাপন করা হইয়াছে। কানুরামের লিখিত বহু পুঁথি ছিল, সে সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার শিষ্যগণ কয়েক বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহার আয়ে দেবসেবার কার্য্যনির্ব্বাহ হইত।

সদাশিব ব্রহ্মচারী পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনায় এবং যোগসাধনে কালাতিপাত করিতেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বিবাহের পরই গৃহত্যাগ করিয়া ৮।১০ বৎসর ভারতবর্ষের বহু তীর্থে পরিভ্রমণ করেন, এবং ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি গৃহী এবং ব্রহ্মচারী উভয়ই ছিলেন, কিন্তু সর্ব্বদা সাধনাতেই অধিক সময় নিয়োগ করিতেন। পুরাতন কাগজপত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ভুরশুট পরগণার অন্তর্গত চাকদাগ্রামের ৺ ভুবনেশ্বরী দেবীরও তিনি সেবাইত ছিলেন। ঐ দেবীর সম্পত্তির কি অবস্থা ঘটিয়াছে আমরা অবগত নহি। বোধ হয়, রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ সেবাইৎ-কার্য্য পরিত্যাগ করেন। সদাশিবের লিখিত বহু পুঁথি ছিল, তাহাও কীটদষ্ট হইয়াছে।

রামসুন্দর বিদ্যাভূষণও এই বংশের উজ্জ্বল রত্ন। তিনি উচ্চদরের সাধক ছিলেন বোধ হয় না। তিনি বেদান্ত, দর্শন, ন্যায়, সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এই সকল শাস্ত্রের আলোচনাতেই ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার লিখিত প্রায় ৫০০ শত পুঁথি ছিল; একখানি রামায়ণ ভিন্ন অন্য কোন পুঁথি ক্ষণে নাই।

রামমোহন ন্যায়ভূষণ ও রামজয় বিদ্যাসাগর পিতার যোগ্য পুত্র। তাঁহাদের ভ্রাতারা সংস্কৃত ভাল জানিতেন না। জ্যেষ্ঠ রামজয় সংসারে লিপ্ত থাকিতে চাহিতেন না। তিনি শাস্ত্রচর্চ্চাতেই জীবন অতিবাহিত করিতেন। রামমোহন সকল শাস্ত্র পড়িলেও ন্যায় এবং স্মৃতিতেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন; জ্যোতিষেরও আলোচনা করিতেন। তাঁহার প্রস্তুত বহু কোষ্ঠীর নকল পরেশবাবুর হস্তগত হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ১৮০৬ কি ১৮০৭ সালে কলিকাতায় সূর্ত্তিবাগানে এক টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। ৩ বা ৩৷৷০ কাঠা জমি তিনি কোন সদাশয় ব্যক্তির নিকট দানসূত্রে প্রাপ্ত হন এবং তাহাতে টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। তিনি তৎকালীন কলিকাতা সমাজে সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ৺রামকমল সেন, ৺শিবচন্দ্র মল্লিক, ৺গোবিন্দচন্দ্র দে, ৺মাধবচন্দ্র দত্ত, ৺মতিলাল শীল প্রভৃতি তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এক শিষ্য তাঁহাকে ৯ নং ভবানীচরণ দত্তের লেনের বাটী দান করেন এবং তিনি এই বাটীতেই থাকিতেন; ছাত্রেরা টোলে থাকিত। তাঁহার দুই ছাত্র ৺রাজচন্দ্র তর্কবাগীশ (পরেশবাবুর) এবং রামতারণ চূড়ামণির সংবাদ আমরা জানি; অন্য ছাত্রদিগের নাম জানি না। স্বগ্রামের সন্নিহিত অঞ্চলে ও সর্ব্বত্র তাঁহার যশঃসৌরভ বিকীর্ণ হইয়াছিল। পরেশবাবুর বাটী অদ্যাপি ন্যায়ভূষণের ভিটা নামে পরিচিত। তিনি পুরুষানুক্রমে ৺দুর্গাপূজা, ৺কালীপূজা প্রভৃতি যাহা চলিয়া আসিতেছিল, সে সকল অতি সমারোহে নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র চোর এবং দস্যুর ভয় ছিল। ডাকাইতগণ দুইবার তাঁহার বাটী লুণ্ঠন করে।

রামমোহন ন্যায়ভূষণের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীনাথ ন্যায়ালঙ্কার। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বগ্রামের পণ্ডিতসমাজ হইতে

ন্যায়ালঙ্কার উপাধি লাভ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং তথায় প্রতিষ্ঠা-লাভ-মানসে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিদ্যাবত্তার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁহাকে একখানি সার্টিফিকিট দেন, তাহাতে যোগধ্যান শর্ম্মা, হরনাথ শর্ম্মা, নিমাই শর্ম্মা, শম্ভুচন্দ্র শর্ম্মা, জয়গোপাল শর্ম্মা, প্রেমচাঁদ শর্ম্মা, হরিপ্রসাদ শর্ম্মা এবং গঙ্গাধর শর্ম্মার স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। অনুমান ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জমিদারের নায়েবের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আসামে চলিয়া যান এবং সেখানে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী-দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার যত্নে গৌহাটীতে নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয় এবং অন্যান্য স্থানে পাঠশালা প্রভৃতি স্থাপিত হয়। তিনিই আসামে ভাষা শিক্ষার প্রবর্ত্তয়িতা এবং তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট প্রণালী-অনুসারে তথায় আসামীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। তিনি একখানি অভিধান রচনা করিয়াছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি কয়েক মাসের জন্য বাটী চলিয়া আসেন এবং ফিরিয়া যাওয়ার সময় ভাগিনেয় যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কে (আলা-বাসী) সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহারই অনুরোধে যদুনাথ কমিশনর আফিসে একটী চাকরী প্রাপ্ত হন এবং পরে হেড্ ক্লার্ক হইয়াছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার উপরিস্থ কোন সাহেব কর্ম্মচারীর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া চাকরী পরিত্যাগ করেন এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর রবিন্সন সাহেবের এবং অন্যান্য সাহেব ও আসামী বন্ধু-দিগের অনুরোধে পুনরায় আসামে ফিরিয়া যান এবং পূর্ব্বপদে (নর্ম্মাল স্কুল-সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট-পদে) প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি মাসিক ৮০৲ টাকা বেতন পাইতেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি আসাম হইতে চলিয়া আসেন। তাঁহার ন্যায় নির্ভীক, স্বাধীনচেতা, সত্যবাদী,

এবং দয়াশীল ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। তিনি চাকরীতে ইস্তফা দেওয়ায় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পেন্সন দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং গ্রাটিয়ুটী দিতে চাহেন, কিন্তু আসাম গবর্ণমেণ্ট পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট অবশেষে তাঁহার বেতনের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ২৬৷৶৮ পাই পেন্সন মঞ্জুর করেন। তিনি আসামে অবস্থান-কালে বেতনের মাত্র সিকি অংশ রাখিয়া বার আনা অংশ দানে এবং পরোপকারে নিয়োগ করিতেন। তিনি পিতাকে মধ্যে মধ্যে অতি সামান্য অর্থসাহায্য করিতেন। পেন্সনের তাবৎ টাকাই তিনি দান করিয়া দিয়াছেন, তাহা আমরা চক্ষে দেখিয়াছি। তিনি প্রতিমা কিম্বা মূর্ত্তির উপাসনা করিতেন না। তিনি নৈমিত্তিক ছিলেন—দিবসে ৩।৪ ঘণ্টা কাল এবং রাত্রিতে ৩।৪ ঘণ্টা কাল ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিতার টোলের ভূমি পিতার এক শিষ্যকে দান করিয়া গ্রামে চলিয়া যান। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে যে ভীষণ ঝটিকা হয়, তাহার পর বৎসর হইতে তিনি দুর্গা-পূজাদি বন্ধ করিয়া দেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গোশা গ্রামে প্রথম ম্যালে-রিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা চলিয়া আসেন। ঐ বৎসর ৯ নং ভবানীচরণ দত্তের গলির সংলগ্ন ১০নং জমি ও বাটী শ্রীনাথ বরাটের নিকট ৮০০০৲ টাকায় খরিদ করা হয় এবং দুইখানি বাটীর আবশ্যক পরিবর্ত্তনে ৬০০০৲টাকা ব্যয় করা হয়। ১৮৭৬ সালে তিনি সপরিবারে এই নূতন বাটীতে আগমন করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে গোপীনাথ ঐ বাটীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

পরেশচন্দ্রের পিতামহ রামেশ্বর বন্দ্যো গোপীনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি সংস্কৃত উত্তমরূপ শিক্ষা করেন নাই। তিনি বিষয়-কর্ম্মেই ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি কখন কলিকাতায় এবং কখন গ্রামে থাকিতেন। তিনি সচ্চরিত্র এবং বিনয়ী ছিলেন। এবং এইজন্য সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেন।

গোপালচন্দ্র স্বনামধন্য পুরুষ। কাশীনাথের মৃত্যুর পর তিনি রামমোহনের বংশের একমাত্র বংশধর থাকায় সকলেরই বড় আদরের সামগ্রী হইয়া উঠেন এবং অনেক বয়স পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন নাই। ১৪।১৫ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আনীত হন এবং ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; গণিতে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং ১০৲ টাকা স্কলারসিপ প্রাপ্ত হন। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী। কলেজে প্রবিষ্ট হওয়ার এক বৎসর পরেই পিতামহের পোষ্যবর্গের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় এবং তিনিও অতিবৃদ্ধ হইয়া পড়ায়, পৌত্রের অধ্যয়নের ব্যয়ভারবহনে অসমর্থ হওয়ায়, তাঁহাকে ক্ষোভের সহিত কলেজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। তিনি একাউণ্টাণ্ট জেনারল আফিসে ২৫৲ টাকা বেতনের একটী চাকরী লাভ করেন এবং ৪।৫ বৎসর তথায় কার্য্য করেন। কিন্তু তাঁহার মনে উচ্চাশা রহিয়াছে, তিনি সামান্য চাকরীতে সন্তুষ্ট থাকিবেন কিরূপে? তিনি তাঁহার এক বন্ধু বাবু বীরনৃসিংহ দের নিকট ১০০০৲ হাজার টাকা এই সর্ত্তে ঋণগ্রহণ করেন যে, তিনি আসামে কারবার খুলিবেন এবং তাঁহাকে ৷৷৶০ আনা লভ্য দিবেন; তিনি নিজে ৫০০৲ টাকা দিবেন এবং ।৵০ আনা লভ্য গ্রহণ করিবেন। তাঁহার সহিত গোপনে এই পরামর্শ করিয়া, তিনি গোপীনাথের অজ্ঞাতসারে ১৫০০৲ টাকা মূলধন লইয়া আসামে পলাইয়া যান (১৮৬৪ খৃঃ)। গৌহাটীতে তখন গোপীনাথের পরিচিত অনেক সাহেব এবং আসামবাসী ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সহানুভূতি প্রার্থনা করিলে, সকলেই তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি অবিলম্বে একটী দোকান খুলিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় এবং কার্য্য-

কুশলতা-গুণে এবং শুভাদৃষ্টের ফলে তিনি শীঘ্রই কারবারে আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিলেন। পরেশচন্দ্র ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে গৌহাটীতে যান। সেখানে গিয়া দেখেন যে, তিনি আসামের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত। তিনি উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী এবং আসামী কর্ম্মচারীদিগের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ; সাহেবেরাও সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন এবং ভালবাসেন। কমিশনর সাহেব প্রভৃতি তাঁহার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ এবং পরামর্শ করিতে সর্ব্বদাই আসেন। তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠানেরই সদস্য। তিনি দরিদ্র ও ধনী সকলেরই সুহৃদ্ ; তাঁহার অমায়িকতাগুণে সকলেই মুগ্ধ। তিনি বহু বিপন্ন বাঙ্গালী এবং আসামীকে চাকরীতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বাসায় প্রত্যহই ৪।৫ জন অতিথি থাকিত। ১৮৭০ সালের পূর্ব্বেই তিনি ২ খানি বাঙ্গালা এবং ৩ খানি চা-বাগান খরিদ করেন ; রবার মহালও ইজারা লন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে শিলংয়ে গিয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শিলংয়ে একটী দোকান স্থাপন করেন। ৮৬৬ সাল হইতে ইণ্ডিয়া জেনারেল ষ্টিম ন্যাভিগেসন কোম্পানীর এজেন্সী গ্রহণ করেন। এতগুলি ব্যাপার একা পরিচালন করিতে গেলে কিরূপ নৈপুণ্য এবং সামর্থ্য আবশ্যক তাহা সহজে অনুমেয়। পরে সোডা ওয়াটার কলও স্থাপন করেন। দুই এক বৎসর শিলং টঙ্গা সার্ভিসও চালাইয়াছিলেন। এরূপ কষ্টসহিষ্ণু, ধৈর্য্যশালী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি কয় জন মিলে ? ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন আর আসামে যান নাই। ১৮৮২ হইতে ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কলিকাতায় থাকিয়াও তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কারবার সমভাবে চালাইয়া গিয়াছেন। কারবারে সময়ে সময়ে ক্ষতি সহ্য করিতে হয়,

কিন্তু তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে শিলং এবং গৌহাটীর দোকান ভগ্ন হয় এবং ৩০।৩৫ হাজার টাকা ক্ষতি হয়, তাহাতেও তিনি ভগ্নোৎসাহ হন নাই। তিনি এবং বীরনৃসিংহ দে ১৮৭৮ সাল হইতে প্রত্যেক ॥০ আনার সরিক হন। ॥৵০ আনার এক সরিক নরসিংহচন্দ্র দে কারবারের সংশ্রব ত্যাগ করেন, তিনি বীর নরসিংহ দের ভ্রাতা ছিলেন। ১৮৯২ সালে বীর নরসিংহ দের মৃত্যু হয়। ১৮৯৫ সালে তাঁহার ওয়ারিশগণ কারবারের সংশ্রব ত্যাগ করিতে চাহিলে যে হিসাব নিকাশ হয়, তাহাতে তাঁহাদের প্রায় ৩০,০০০ হাজার টাকা দেনা সাব্যস্ত হয়। তাঁহাদের বিপন্ন অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং তাঁহাদের পিতার বাল্যকালের ১০০০৲ টাকা ঋণদান স্মরণ করিয়া, গোপালচন্দ্র ঐ টাকার দাবি পরিত্যাগ করেন। অধিকন্তু ১৬,০০০ হাজার টাকা নগদ এবং হ্যারিসন রোডের ১০,০০০৲ টাকা মূল্যের একখণ্ড জমি তাঁহাদিগকে দান করেন। এরূপ উদারতার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। কারবারের ষোল আনা মালিক হওয়ার অল্পদিন পরেই পূর্ব্বোক্ত ভীষণ ভূমিকম্প। ১৮৯৫ সাল হইলে ৺দুর্গাপূজা পুনরায় আরম্ভ করেন, এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত পূজা, কালীপূজা, দোল, রাস, রথ প্রভৃতি সমারোহের সহিত অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তিনি দরিদ্র জ্ঞাতি-কুটম্বদিগকে অর্থসাহায্য করিতেন। যে কেহ তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে, কাহাকেও প্রত্যাখান করেন নাই। পথে অন্নক্লিষ্ট কাঙ্গাল দেখিলে বাটীতে ডাকিয়া আনিয়া অন্ন দিতেন। আতুর এবং বৃদ্ধকে বস্ত্র দান করিতেন। তাঁহার গৌহাটী, শিলং, গোশা, এবং কলিকাতার কর্ম্মচারীরা তাঁহার কত দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়াছে, তিনি সকলই উপেক্ষা করিয়াছেন, কথনও তজ্জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করেন নাই। সকল উৎসবে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকে নিজে উপস্থিত থাকিয়া ভোজন করাইতেন—সকলের

সহিত বন্ধুভাবে কথোপকথন করিতেন। যিনি একবার তাঁহার সংসর্গে আসিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

তাঁহার মানসিক বলের পরিচয় কি দিব? তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, জ্যেষ্ঠা কন্যা, তাঁহার পৌত্র, দৌহিত্র অকালে ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেহ তাঁহাকে শোকে অভিভূত হইতে দেখে নাই। প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু বাহ্যাড়ম্বর কেহ দেখে নাই। বেশভূষার পরিপাট্য ছিল না। পাছে ছেলেরা এবং পৌত্রেরা বিলাসী হইয়া পড়ে, এই ভয়ে গাড়ী-ঘোড়া করেন নাই। রেল-গাড়িতে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিতেন। শরীর অসুস্থ না হইলে পাল্কীতে আরোহণ করিতেন না। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তৌলক, তন্তুবায়, স্বর্ণবণিক প্রভৃতি অনেকেরই সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। দুর্গানাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গিরিশচন্দ্র ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় দুইবার অকৃতকার্য্য হইলে তিনি তাঁহাকে কারবার শিক্ষা দেন। তিনি দক্ষতার সহিত ১৮৮২ হইতে ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত কারবার চালাইয়া গিয়াছেন—শিলংয়েই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার সৌজন্যের এবং সহৃদয়তার জন্য তিনি সকলেরই ভালবাসা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এবং কাব্য তাঁহার বড় প্রিয় ছিল এবং তিনি সময়ে সময়ে অনেক ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

পরেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ১৮৬৮ সালে প্রথম গৌহাটী স্কুলে ভর্ত্তি হন; ১৮৭৪ সালে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন। স্কুলের সকল শ্রেণীর পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পুরস্কার লাভ করেন। এণ্ট্রান্স হইতে এম-এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং স্কলার্সিপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৮৩ সালে টেগোর বা ঠাকুর আইন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং স্বর্ণ

পদক প্রাপ্ত হন। ১৮৮০ সালে সংস্কৃতে পারদর্শিতার জন্য প্যাচিটি পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী, মুঙ্গের এবং রঙ্গপুরে ওকালতি করেন। রঙ্গপুরে তাঁহার মাসিক আয় ৮০৲।৮৫৲ টাকা ছিল, কিন্তু উচ্চাশায় প্রণোদিত হইয়া তিনি ১৮৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৯০ এবং ১৮৯১ এই দুই বৎসর ওকালতি করিয়া মাসিক ৩৫৲।৪০৲ টাকার অধিক আয় না হওয়ায় তিনি ১৮৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে মুন্সেফী চাকরী গ্রহণ করেন। তিনি চাকরীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ১৯১৩ সালের শেষভাগে আসিষ্টাণ্ট সেসন্স জজ-পদ লাভ করেন এবং শেষে মুঙ্গেরে জজ-পদ লাভ করিয়া ১৯১৮ সালে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার অনেক বন্ধু আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি কলিকাতার হাইকোর্টের জজ-পদে উন্নীত হইবেন কিন্তু সে সুযোগ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। তাহার কার্য্যকুশলতার জন্য বিহার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি-দানে সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রজীবনে তিনি তৎকালীন "ষ্টুডেণ্ডস এসোসিয়েসনে"র সম্পাদক ছিলেন এবং ওকালতির সময়ে কংগ্রেসেও যোগদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সাহিত্য, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, তন্ত্র প্রভৃতির আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন—"ভারতবর্ষ", "বসুমতী", "মানসী", "নবযুগ" প্রভৃতি পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন এবং হরিপালের সংস্কার ও উন্নতির জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। বংশের কীর্ত্তিকলাপগুলিও যথাসম্ভব বজায় করিয়া আসিতেছেন।

সুরেশচন্দ্র পরেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি বণ্টনসূত্রে শিলং দোকানের স্বামিত্ব লাভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহা চালাইয়া গিয়াছেন। তিনি গৌহাটীতে জীবন কাটাইয়াছেন—সেখানে ২০,০০০ হাজার

টাকা ব্যয় করিয়া "শঙ্করমঠ" স্থাপন করিয়াছেন এবং মঠের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ৬০।৬৫ টাকা মাসিক আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। তিনিও নানা মাসিক পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি গৌহাটীবাসীদের নিকট সুপরিচিত।

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। তিনি বণ্টনসূত্রে গৌহাটীর দোকানের স্বামিত্ব লাভ করিয়া তাহা চালাইয়া আসিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রভূত অনুরাগ। তিনি সম্প্রতি স্বগ্রামে ৺ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মহাদেবপুর ছোটতরফ (রায়চৌধুরী)
জমিদার-বংশ

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন অভিজাত-বংশের মধ্যে মহাদেবপুর রায়চৌধুরী বংশ অন্যতম। মোগল বাদসাহগণ যখন ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন সেই সময়ে এই জমিদারীর সৃষ্টি হয়। এই জমিদারীর আদি ইতিহাস আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। যতদূর জানিতে পারা যায়, মোগল সম্রাটদিগের আমলে উত্তর বঙ্গে ২১টী বিভাগের উল্লেখ ছিল; যথা (১) বাহারুল (২) মণ্ডলঘাট (৩) আরসা (৪) চুণাখালি (৫) আহম্মদনগর (৬) জাহাঙ্গীরপুর (৭) আটিয়া কাগমারি (৮) শালবাড়ী (৯) তাহিরপুর (১০) চাঁদনাই (১১) পাটিলদহ (১২) সন্তোষ (১৩) আলাপসিং (১৪) সাতসিকা (১৫) মোহামেদ আমিনপুর (১৬) পলজস খড়দহ (১৭) পুখিরা (১৮) মাইহাটি (১৯) হুজুরী তালুক (২০) আকবরনগর (২১) খুচরা মহল।

উক্ত বিভাগগুলির মধ্যে জাহাঙ্গীরপুর জমিদারী মহাদেবপুর রায়-চৌধুরী বংশের অধিকৃত হয়। এই জমিদারী বারবাকাবাদ ও পিঞ্জে সরকারের অন্তর্গত এবং কতিপয় পরগণায় বিভক্ত ছিল। পূর্ব্বে এই জমিদারীর অধিকারী কে ছিলেন তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে বঙ্গাব্দ ১১৩৫ হইতে ১১৬৪ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত রামেশ্বর চৌধুরী নামক রাঢ়ী শ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ এই জমিদারীর মালিক বলিয়া উল্লিখিত আছে। কথিত আছে যে, বীরভূম জিলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর গ্রামের বিখ্যাত মুখোপাধ্যায়-বংশীয় নয়ানচাঁদ মুখোপাধ্যায় মোগল বাদসাহ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে এই জমিদারী প্রাপ্ত হয়েন এবং বাদসাহ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া রায়চৌধুরী খেতাব দেন। তদবধি

এই বংশে রায়চৌধুরী খেতাব চলিয়া আসিতেছে। নয়ানচাঁদের পর পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ দেবীবর রায়ের আমল পর্য্যন্ত জমিদারী অবিভক্ত অবস্থায় ছিল এবং তজ্জন্য সালিয়ানা ৬৪,২৪৯৲ টাকা সরকারে কর দিতে হইত। দেবীবরের দুই পুত্র ছিল, রামভদ্র রায় ও রামেশ্বর রায়। ইঁহাদের সময় জমিদারীর পরিচালনায় গণ্ডগোল হইতে লাগিল। রাজস্ব আদায় করিতে না পারিয়া রামভদ্র রায় বিরক্ত হইয়া জমিদারীর অংশ ত্যাগ করিলেন। অতঃপর রামেশ্বর রায় সমগ্র জমিদারীর মালিক হইলেন। রামভদ্র রায়ের বংশ এখনও বেঘোরায় বাস করিতেছেন। ঐ অঞ্চলে এই শাখার বেশ প্রতিপত্তি আছে।

উল্লিখিত রামেশ্বর চৌধুরীর মৃত্যু হইলে তাঁহার তিন পুত্র তুল্যাংশে জমিদারী প্রাপ্ত হয়েন। এই তিন পুত্রের নাম গোবিন্দ, রুদ্ররাম ও বীরেশ্বর। বঙ্গাব্দ ১১৭৩ অব্দে যখন রেজা খাঁ বাঙ্গলার নায়েব দেওয়ান ছিলেন, সেই সময় সমগ্র জমিদারীর ভার বীরেশ্বরের উপর অর্পিত হয় এবং বীরেশ্বরের অপর ভ্রাতারা স্বত্বচ্যুত হয়েন।

বীরেশ্বরের চারি পুত্র ছিল—কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, লক্ষ্মীকান্ত ও গৌরীকান্ত। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বীরেশ্বরের মৃত্যু হইলে কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, গৌরীকান্তের বিধবা পত্নী যজ্ঞেশ্বরী ও লক্ষ্মীকান্তের বিধবা পত্নী লক্ষ্মীশ্বরী সমগ্র জমিদারী তুল্য চারি অংশে ভোগ করিতে থাকেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গোবিন্দ ও রুদ্ররাম সম্পত্তিচ্যুত হয়েন। এই সময়ে তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিগণের জন্য জমিদারী হইতে মাসোহারা বন্দোবস্ত হইল। তৎপরে এই মাসোহারা কায়েমী হইয়া যায় এবং জমিদারীর রাজস্বের সহিত গণ্য হয়। এক্ষণে ইঁহারা রাজসাহী কালেক্টরী হইতে ২,৮৪৪।১৫ টাকা স্থায়ী মালিকানা-হিসাবে প্রাপ্ত হইতেছেন।

বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইলে সমগ্র জমিদারীটি চারি

ভাগে বিভক্ত হইয়া চারিটী স্বতন্ত্র জমিদারীতে পরিণত হইল। পরবর্ত্তী-কালে দিনাজপুর কালেক্টরীতে ২৮, ৩৫, ৪০ ও ৪২ নম্বর তৌজিতে চারিটী হিস্যা পৃথক্ পৃথক্ অভিহিত হয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এই জমিদারী রাজসাহী কালেক্টরীর এলাকাভুক্ত হয় এবং যথাক্রমে ২১৯৯, ২২০০, ২২০২ ও ২২০৩ নম্বরভুক্ত হয়। ২২০৩সংখ্যক জমিদারী এখনও রামেশ্বর রায়ের বংশধরগণ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। নওগাঁও মহকুমার মহাদেবপুর নামক গ্রামে ইঁহারা বাস করিতেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় উল্লিখিত জমিদারী-চতুষ্টয় হইতে অনেকগুলি তালুকের সৃষ্টি হয় এবং তালুকগুলি পৃথকভাবে বন্দোবস্ত করা হয়। ২২০০ নম্বরভুক্ত জমিদারী হইতে এত বেশী তালুক কাটিয়া লওয়া হয় যে, ফলে অপর তিনটি শাখা অপেক্ষা এই শাখার আয়তন ক্ষুদ্রতম হইয়া পড়ে, যদিও সকল শাখাগুলিই মূলতঃ সমাংশে বিভক্ত হইয়াছিল।

মহাদেবপুরের জমিদার-বংশ অতি প্রাচীন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় হইতেই ইঁহারা বৃটিশের রাজভক্ত প্রজা বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও ইঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। এমন কি, ইঁহারা এখনও বিনা পাশে বন্দুক ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এক সময় ইঁহারা কামান ব্যবহার করিবার অনুমতিও পাইয়াছিলেন। ৺শ্যামানাথ রায়চৌধুরী সরকারের বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। তিনি "রাজা" উপাধি পাইবেন এরূপ আভাস পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু অকালে ৩৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তিনি সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে বাঁকিপুরে যে সরকারী দরবার হয় তাহাতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজাকে সুন্দর হস্তিদন্ত উপহার দেন। এই উপহার সাদরে গৃহীত হইয়াছিল।

সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং

ভারতে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন সেই উপলক্ষে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পল ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে শ্যামানাথ রায়কে বাঙ্গালার অন্যতম প্রাচীন ভূস্বামী বলিয়া একখানি সার্টিফিকেট অব অনার প্রদান করেন। ঐ সার্টিফিকেটে লিখিত থাকে—"In recognition of his performance of the duties of a large landed proprietor of ancient family" অর্থাৎ প্রাচীন বংশসম্ভূত এই ভূস্বামী বিস্তীর্ণ জমিদারীর পরিচালনায় যে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে এই সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইল।

মহাদেবপুরের জমিদার মহাশয়গণ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারত সরকারকে বিশেষ সহায়তা করেন। বৃটিশবাহিনীর তিব্বত অভিযানের সময় যখন সেনাদল মহাদেবপুর জমিদারীর এলাকা দিয়া গমন করে সেই সময় জমিদারমহাশয়গণ তাহাদিগকে প্রচুর রসদ জোগাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগের সুখের জন্য যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্য সময়েও তাঁহারা সরকারের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

স্বধর্ম্মে আনুরক্তি

এই বংশের রামেশ্বর রায়, বীরেশ্বর রায় প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। প্রায় সকল মৌজায় ইঁহারা বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পূজা-ভোগাদির জন্য দেবোত্তরস্বরূপ বহু ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানদিগের মসজিদ প্রভৃতি স্থান রক্ষার্থ অনেক পীরোত্তর ভূমিও ইঁহারা সৃজন করিয়া গিয়াছেন। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষেরা ধর্ম্মে যেরূপ নিষ্ঠাবান্ ছিলেন প্রজারঞ্জনেও ইঁহারা তদ্রূপ সুযশঃ লাভ করিয়াছিলেন। জমিদারীর মধ্যে কখনও কোন অশান্তির সৃষ্টি হয় নাই। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের স্থাপিত অনেকগুলি বিগ্রহ বর্ত্তমানে রাজসাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটী-গৃহে রক্ষিত হইয়াছে।

তিলনা ও কামারদহের সিদ্ধেশ্বরী মূর্ত্তি ও দেবীপুরের আগ্যামাতার মূর্ত্তি এই বংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ এখনও জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

হরিমণি দেবী

পূর্ব্বেই লিখিত হইযাছে যে, শ্যামানাথ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বঙ্গাব্দ ১২৭৯ সনে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। নাবালক পুত্র নরেন্দ্র-নাথ ও স্ত্রী হরিমণি দেবীকে রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করিলে হরিমণি দেবী জমিদারী পরিচালনা করিতে থাকেন। তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত জমিদারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। জনহিতকর কার্য্যে তিনি বহু অর্থ দান করিয়া গিযাছেন। এখনও পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলে লোকে তাঁহার কীর্ত্তিগাথা গাহিয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে হরেন্দ্রনাথও অকালে পিতার ন্যায় প্রাণ হারাইলেন। বঙ্গাব্দ ১২৯৮ সালে মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১২৯৭ সালে ৬ই আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহী হরিমণি দেবী শোক-সাগরে নিমজ্জমানা হইলেও শিশু পৌত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও জমিদারীর পরিচালনা করিতে লাগিলেন। নারায়ণচন্দ্র ১৩২৭ সালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জমিদারীর ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হয়েন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, নারায়ণচন্দ্র দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি বজায় রাখুন এবং লোকহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া যশস্বী হউন।

রায় বাহাদুর নারায়ণচন্দ্র

নারায়ণচন্দ্র অল্পকালেই জমিদারী পরিচালনায় দক্ষতালাভ করিয়া-ছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ও বঙ্গীয়

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র রায় চৌধুরী

শাসন পরিষদের সদস্য স্যর নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের কন্যার সহিত নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে। কলিকাতা বহুবাজারের প্রসিদ্ধ মতিলাল-বংশের সুরেন্দ্রনাথ মতিলাল ইঁহার মাতামহ ছিলেন। নদীয়ার মহারাজ পরলোকগত ক্ষৌণীশচন্দ্র ইঁহার মাসতুতো ভাই ছিলেন। উত্তর-পাড়ার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, এম-এল-এ তাঁহার আর একজন মাসতুতো ভাই। সাতক্ষীরার জমিদার-বংশের সহিত ও ঢাকা জয়দেব-পুরের রাজবংশের সহিতও নারায়ণচন্দ্রের আত্মীয়তা আছে।

নারায়ণচন্দ্র বুদ্ধিমান্, মেধাবী ও সদাশয়। বংশগৌরবে ও আভিজাত্যে তিনি বহু উর্দ্ধে আছেন সত্য, কিন্তু তিনি গ্রামবাসীদিগের ও প্রজাগণের মধ্যে জাতিধর্ম্মবর্ণ-নির্ব্বিশেষে মেলামেশা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। বদান্যতা ও দানশীলতায় তিনি ইতিমধ্যেই রাজসাহী জিলায় সুযশঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লোকহিতকর কার্য্যে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ আছে। তাঁহার পিতামহ কর্ত্তৃক স্থাপিত দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহার অর্থসাহায্যে ও পরিচালনায় দেশের প্রকৃত হিতসাধন করিতেছে। ১৩২৫ সালে উত্তরবঙ্গে যে ভীষণ বন্যা হইয়াছিল তাহার স্মৃতি বঙ্গবাসী বহুদিন মনে রাখিবে। বন্যাপীড়িত লোকদিগের সাহা-য্যার্থ নারায়ণচন্দ্র অর্থাদি দান করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তৎপরে পুনরায় ১৩২৯ সালেও ঐ অঞ্চলে গ্রামবাসীদিগের সাহায্যার্থ তিনি অর্থদান করিয়া দানশৌণ্ডত্বের পরিচয় দিয়াছেন। দরিদ্রের ক্রন্দন নারায়ণের কর্ণে প্রবেশ করিতে বিলম্ব করে না। দরিদ্রের মঙ্গলবিধানের জন্য নারায়ণচন্দ্র সদৈব ব্যগ্র। দরিদ্রসেবার অবসর পাইলে নারায়ণচন্দ্রের স্বীয় স্বার্থ ও আভিজাত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ থাকে না। নারায়ণচন্দ্রের দানে রাজসাহী জিলার বহু দরিদ্র ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন। দানশীলতা ও বদান্যতা বিরল

নহে, কিন্তু নারায়ণচন্দ্রের সরল অন্তঃকরণ ও অমায়িক ব্যবহার বোধ হয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদৃশ সুলভ নহে। কি ইতর, কি ভদ্র নারায়ণচন্দ্রের সংস্পর্শে যিনি আসিবেন তাঁহাকেই প্রীতি অনুভব করিতে হইবে। অল্পকাল মধ্যেই তিনি সদনুষ্ঠান দ্বারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বাঙ্গালা সরকার তাঁহাকে দরবারে ও লেভীতে উপস্থিত হইবার অনুমতি দিয়াছেন। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত-আগমনোপলক্ষে বাঙ্গালায় যে লেভী দরবার বসিয়াছিল নারায়ণচন্দ্র তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গত ১৯২৯ খৃঃ অঃ নববর্ষের উপাধি-বিতরণ সময়ে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছেন। নারায়ণচন্দ্র নওগাঁ লোক্যাল বোর্ড ও রাজসাহী জেলা বোডের নির্ব্বাচিত সদস্য। নারায়ণচন্দ্র নওগাঁও লোকাল বোর্ডের অন্যতম মনোনীত সদস্য।

সদনুষ্ঠান ও দান

জানকীনাথ রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গানাথ। দুর্গানাথের পুত্র রামগোপাল মহাদেবপুরে একটী মধ্য ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। নারায়ণচন্দ্র গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ব্যয়ে ঐ স্কুলটীকে উচ্চ ইংরাজী স্কুলে উন্নীত করেন এবং তদীয় মাতা সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর নামে ইহার নামকরণ হয়। রামগোপালের অন্যতম পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র ঐ গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। নারায়ণচন্দ্রের পিতামহ শ্যামানাথ স্বগ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া যায়েন। নারায়ণচন্দ্রের উদ্যমে ও অর্থব্যয়ে এই চিকিৎসালয়ের ইষ্টক-ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং নারায়ণচন্দ্রের চেষ্টায় গ্রামে একটি টেলিগ্রাফ অফিসও বসিয়াছে। বর্ত্তমানে গ্রামের অনেক উন্নতিবিধান হইয়াছে। এই চিকিৎসালয়ে এক্ষণে একজন এম-বি পাশ ডাক্তার কার্য্য করিতেছেন। শ্যামানাথের

চেষ্টায় মহাদেবপুরে ডাকঘর ও থানা স্থাপিত হয়। থানাবাড়ীর জন্ম শ্যামনাথ ভূমি দান করিয়াছিলেন।

দানের তালিকা

১। নওগাঁও সাধারণ পাঠাগার-নির্ম্মাণকল্পে এককালীন দান—২০০৲ টাকা।

২। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি-রক্ষার্থ দান—৫০০৲ টাকা

৩। শিলং পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে দান—১০০৲ টাকা।

৪। নওগাঁও হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য বোর্ডিং বাটী নির্ম্মাণ জন্য দান—১১০০৲ টাকা।

৫। ১৩২৫ সালে উত্তরবঙ্গ বন্যায় সাহায্য—৩০০৲ টাকা।

৬। বন্যাপীড়িত অন্যান্য স্থানে সাহায্য –৩০০৲ টাকা।

৭। ১৩৩১ সালে নওগাঁও দাতব্য চিকিৎসালয়ে দান—৭৫০৲ টাকা।

৮। অন্যান্য দাতব্য চিকিৎসালয় ফণ্ডে দান—৪০৮০৲ টাকা।

৯। মহাদেবপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে দান—১৩৬০০৲ টাকা।

১০। মহাদেবপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলের গৃহনির্ম্মাণকল্পে দান—১২৪২০৲ টাকা।

১১। বাহুলগাছি দাতব্য চিকিৎসালয়ে দান—২৫০৲ টাকা।

১২। বাঙ্গালা এম্বুলেন্স কোর রিসেপ্সন ফণ্ড ও দরিদ্রদিগের ভোজন জন্য দান—৮৯০৲ টাকা।

১৩। মহাদেবপুর হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য বোর্ডিং-বাটী নির্ম্মাণ জন্য বার্ষিক দান ৬০০৲ টাকা।

১৪। মহাদেবপুরে মুসলমান বোর্ডিং নির্ম্মাণ জন্য দান—২০০৲ টাকা।

১৫। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী শিশু-প্রদর্শনীতে দান -১০০৲ টাকা।

১৬। নওগাঁও অফিসার-ক্লাব নির্ম্মাণ জন্য চাঁদা—১০০৲ টাকা।

১৭। নওগাঁও শিশুপ্রদর্শনীতে দান—৫০৲ টাকা।

১৮। রাজসাহী সাধারণ পাঠাগারে দান—১০০৲ টাকা।

১৯। রাজসাহীতে সাধারণ বার্ষিক দান—৫০৲ টাকা।

২০। নওগাঁও দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডিসেণ্ট্রী ওয়ার্ড জন্য—৩০০০৲ টাকা।

কমিশনার মিঃ ডব্লু এ মার এই চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

২১। রাজসাহী ওয়াটার ওয়ার্কস্ স্থাপন জন্য - ৪০০০৲ টাকা।

২২। রাজসাহী পি এন হাসপাতালে লেডী জ্যাকসান ফিমেল ওয়ার্ড নির্ম্মাণ জন্য দান—১২০০০৲ টাকা।

২৩। মহাদেবপুর হাই ইংলিশ স্কুল রিজার্ভ ফণ্ডে দান—৩০০০৲ টাকা।

২৪। নওগাঁও বালিকা বিদ্যালয়ে এককালীন দান—১০০৲ টাকা।

২৫। রাজসাহী রেড ক্রস সোসাইটীতে এককালীন দান—১০০৲ টাকা।

২৬। নওগাঁও ফায়ার রিলিফ কমিটির হস্তে দান—৫০৲ টাকা।

২৭। নওগাঁ সোস্যাল সার্ভিসের হস্তে দান ৫০৲

২৮। ” হাইস্কুলের ছাত্রদের খেলার মাঠের জমি খরিদ জন্য স্কুল কমিটির হস্তে দান ১০০৲

২৯। নওগাঁ যুবক সমিতির হস্তে দান ২২৫৲

৩০। রাজসাহী কুমারপাড়া কালীমন্দির-নির্ম্মাণকল্পে ৫০৲

৩১। রাইগাঁও মাদ্রাসার গৃহনির্ম্মাণকল্পে দান ১০০৲

৩২। রাজসাহী নবাবগঞ্জের অগ্নিদাহ উপলক্ষে দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ কলেক্টর বাহাদুরের হস্তে দান ৫০৲

৩৩। মহাদেবপুর থানার পুলিশ কনফারেন্স উপলক্ষে দান ৮৮/১৫

৩৪। রাজসাহী পুলিশ ক্লাবে দান ৮০৲

৩৫। মহাদেবপুরে রাজসাহী জেলা শিক্ষক সম্মিলনীর সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান ৭৫৫৲

৩৬। রাজসাহী বযেজ স্কাউট কোবের সাহায্যকল্পে দান ৫০৲

৩৭। বালুরঘাট দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সাহায্যকল্পে দিনাজপুরের কলেক্টর বাহাদুরের হস্তে দান ২০০৲

৩৮। বালুরঘাট হাই স্কুলের সাহায্যকল্পে দান ৫০০৲

৩৯। নওগাঁ মহাদেবপুর ।ডঃ বোঃ রোড পাকা করিবার জন্য দান ১৬০০০৲

৪০। রাজসাহী ইউরোপীয়ান ক্লাবে দান ২০০৲

৪১। খা দ-প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে দান ৫০০৲

৪২। তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে দান ২০০৲

৪৩। মহাদেবপুর টেলিগ্রাফ অফিসের ১৯২৬২৭-২৮ সালের ডেফিসিট পূরণ-কল্পে ১৭৩২/০

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অনেক দান আছে ; তাহার উল্লেখ স্থানাভাবে প্রদান করিতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম হইলাম।

কুলজী (আধুনিক)।
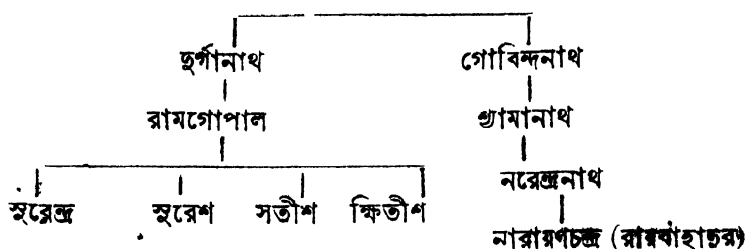
৺নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বংশের আদিপুরুষ রঘুনাথ। তাঁহার পুত্র নারায়ণ হুগলী জেলার খন্নেন ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বেলে শিকরা গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন। এই বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

গয়ারাম বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসনকালে দশসালা বন্দোবস্তের সময় (১৭৯৩ খৃঃ) বীরভূম জেলার দেওয়ান-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বিশেষ কার্য্যদক্ষতার ও সাধুতার পরিচয় দেন।

৺রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি গভর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলার-জেনেরাল অফিসে একটি দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে কর্ম্ম করিতেন। ইনি সদাচার-সম্পন্ন ও নিরলস ব্যক্তি ছিলেন।

৺বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইনিও গভর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলার-জেনেরাল অফিসের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহার নির্লোভ আচরণ ও পরোপকারিতার দৃষ্টান্ত অনেকের গোচরীভূত ছিল।

৺ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনিও কণ্ট্রোলার-জেনেরাল অফিসের একজন পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি মিষ্টভাষী গুণগ্রাহী ও উদার-প্রকৃতির লোক ছিলেন।

৺নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি Military Secretary to the Viceroyএর অফিসে (Esplanade, Calcutta) প্রধান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং কিছু কালের জন্য অস্থায়ী রেজিষ্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কর্ম্ম-উপলক্ষে কলিকাতায় বাস

অনিবার্য্য হওয়ায় প্রথমে কুমারটুলিতে ও তৎপরে ৮৪নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটস্থ ঠিকানায় বাটী প্রস্তুত করিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইনি ব্রাহ্মণের উপযুক্ত নিষ্ঠা, নির্ভীকতা ও নিঃস্বার্থপরতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ইনি গুণের আদর করিতেন। সমগুণ-সম্পন্ন ধনী দরিদ্র সকলকেই ইনি সমানভাবে শ্রদ্ধা করিতেন এবং ভালবাসিতেন। শোভাবাজারের ৺রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের মধ্যম পুত্র ৺রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সহিত ইঁহার যথেষ্ট সদ্‌ভাব ছিল। ইনি বিশেষ ভক্তি ও আয়োজনের সহিত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাদি করিতেন। প্রতি বৎসর মহাপূজার পর একাদশীর দিন ৺রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ইঁহার বাড়ীতে প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। ইনি কৌলীন্যের আদর করিতেন এবং নির্লোভ ও সাধুতার সহিত জীবন যাপন করিতেন।

শ্রীঅঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি একাউণ্ট-জেনেরাল পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফস দিল্লী অফিসে হিসাব-পরিদর্শকের কর্ম্ম করিতেন। এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন। ইনি অগ্রজ ৺নীলকমলের ন্যায় সামাজিকতা গুণের অধিকারী। ইঁহারা দুই ভ্রাতা কুমারটুলীস্থ সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সহিত পরম বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কবিরাজমহাশয় ইঁহাদের দুই ভ্রাতার যত্নে ও আগ্রহে কলিকাতায় স্থায়িভাবে বাস করিতে সঙ্কল্প করেন। ইনি নিরপেক্ষ ও নিরলসভাবে দিনপাত করেন।

৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল—ইনি আলিপুর জজ আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। ইঁহার অসাধারণ আইন-জ্ঞান ছিল। স্বনামধন্য স্যর রাসবিহারী ঘোষ ইঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। ইঁহার বিনয়, কার্য্যদক্ষতা ও শ্রমশীলতা গুণের পরিচয় শীঘ্রই সাধারণের চক্ষে পতিত হয়। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক

পরীক্ষাতেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইনি ১৮৮৫ সালে পদার্থ বিদ্যায় এম্-এ পাশ করেন এবং প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রাতঃস্মরণীয় ৺স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ৺রায় বাহাদুর কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺হেমেন্দ্রনাথ মিত্র এবং ৺প্রসন্নকুমার কারফরমা প্রভৃতি বঙ্গের সুসন্তানগণ ইঁহার সহপাঠী এবং বন্ধু ছিলেন। আলিপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ও গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ৺রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর ইঁহাকে প্রথম অবস্থায় সযত্নে ওকালতি শিক্ষা দেন।

৺হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এজেণ্ট অফিসে একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতেন। ইনি মিষ্টভাষী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। ইনি নানাদেশ পরিদর্শন করিয়া বেশ জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ পান। ইনি শিবপুরের প্রসিদ্ধ চৌধুরী-বংশে বিবাহ করেন। ইনি কয়েকটী শোক পাইবার পর বিশেষ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন ও তৎপরে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পল্লীবাসিগণ ইঁহাকে যথেষ্ট প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— ইনি প্রসিদ্ধ ইংরাজ বণিকের অফিস মেসার্স বামার লরি এণ্ড কোং লিমিটেডের ইণ্ডিয়ান ষ্টাফের সর্ব্বময় কর্ত্তা। সততা, অনুশীলন, সৎসাহস প্রভৃতি গুণের প্রভাবে ইনি অতি অল্পকাল মধ্যেই অফিসের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদে উন্নীত হন। অফিসের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষতঃ Sir Hubert Carr তাঁহার কার্য্যের এবং অধীন কর্ম্মচারিগণ তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং সাধুসঙ্কল্পের নিত্য পরিচয় পাইয়া থাকেন। ইনি পিতার ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও রক্ষণশীল কার্য্যের পথাবলম্বী।

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ – ইনি পিতার ন্যায় অল্পকাল মধ্যেই আলিপুরের জজ আদালতে ওকালতিতে বিশেষ যশঃ লাভ করিয়াছেন। ইঁহার ব্যাখ্যা প্রশংসনীয়। ইনি সাতক্ষীরার ৺প্রাণনাথ চৌধুরীর বংশে বিবাহ

করিয়াছেন। ইনি বন্ধুবৎসল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। ইনি করদাতাগণের প্রতিনিধিস্বরূপ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরসেনের কৌন্সিলর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ ঃ—ইনি বি-এস সি, বি-ই, স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিয়া অল্পদিনের মধ্যে অর্থ ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত আশুতোষ বিল্ডিংস, বার্ণ কোম্পানীর আসানসোলের লৌহের কারখানা প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ বাটী, কারখানা ইহার নক্সা অনুযায়ী ও বিশেষ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ ঃ—ইনি এম-এ; ইনি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত অর্থব্যবহারশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর এম্-এ পাশ করিবার পর স্যর আশুতোষ ইহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগে লেকচারার করিয়া দিয়াছেন। স্যর আশুতোষের সুযোগ্য পুত্র রমাপ্রসাদ বাবুর সহিত ইনি একত্র কলেজে পড়িয়াছিলেন এবং বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঃ—এম-এ, বি-এল; ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট; দর্শনশাস্ত্রে এম্-এ পাশ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে বিশেষ চর্চ্চা ইনি রাখেন। অশেষগুণালঙ্কৃত অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ ইহাকে যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঃ—আই. এসসি, ইনি সেণ্ট পল কলেজ হইতে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইয়া প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হওয়ার জন্যও সর্ব্বসমষ্টিতেও প্রথম হওয়ার জন্য বিশেষ পারিতোষিক পান। এক্ষণে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করিতেছেন। আশা করা যায়, ইনি যথাসময়ে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত এম-বি পাশ করিবেন।

এই নৈকষ্য কুলীন বংশের বিশেষত্ব এই যে, এই বংশের কেহ

কখনও কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করেন নাই এবং সকলেই নিষ্কলঙ্ক চরিত্র লইয়া জীবন যাপন করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

বংশ তালিকা

* খন্যান ষ্টেশনের নিকট (ই-আই আর , জেলা হুগলী।